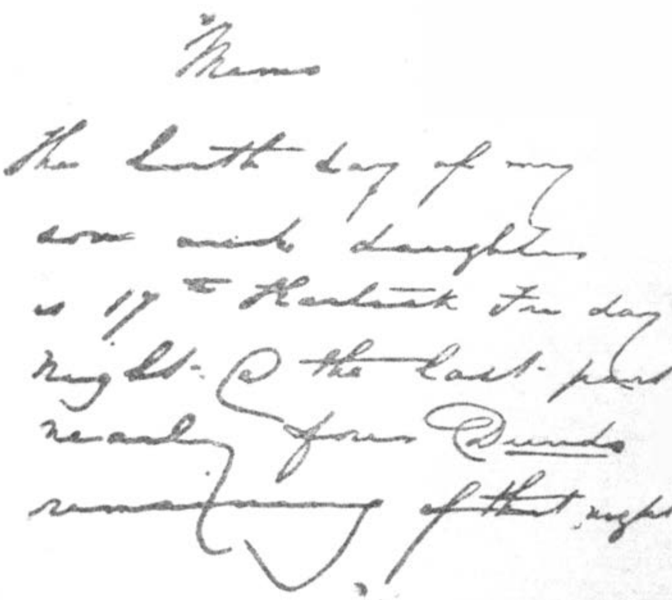


Memo

The birth day of my son and daughter is 17th Kartick Friday night at the last part nearly four Dunds remaining of that night

গ্রন্থকার ও তাঁহার যমজ ভগিনীর জন্ম সম্বন্ধে পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেনের স্বহস্ত লিখিত বাং ১২৭৩ সনের ১৮ই কার্ত্তিক তারিখের স্মারক-লিপি।

শিখা জানালা-পথে প্রবেশ করিয়া যেন অমাবস্যার নিবিড় কৃষ্ণকপালে একটি রক্তচন্দনের টিপ পরাইয়া দিতেছে। ঝিল্লির অবিরাম তানে আমাদের বাগান-বাটী মুখরিত। রাত্রি হয় ত নয়টা, কিন্তু পাড়াগাঁয়ের রাত্রি—চারিদিকে জনপ্রাণীর সাড়া নাই, দিদি পড়িয়া যাইতেন :—

"মহা ভয় উপজিল দেখি রণস্থল।
কুক্কুর গৃধিনী-শিবা করে কোলাহল॥
হাতে মুণ্ড করিয়া নাচয়ে ভূতগণ।
শৃগাল করিছে মাংস শোণিত ভক্ষণ॥
রক্তের কর্দ্দম নদী চলিতে না পারে।
শোকাকুল নারীগণ কাঁদে উচ্চস্বরে॥"

দিদির স্বরে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভয়ের ঝঙ্কার জাগিয়া উঠিত। আমরা বসিয়া যেন স্পষ্ট দেখিতাম, হত সৈনিকের রক্তাক্ত মাথাটা বিকটাকৃতি কবন্ধেরা ছুড়িয়া ফেলিতেছে; তাহারা এত কাছে, বোধ হইত, যেন তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস আমাদের গায় পড়িয়া সর্ব্ব শরীরে একটা ভয়ের শিহরণ জাগাইতেছে।

এই ভাবে রামায়ণ—মহাভারত পড়া চলিত। তরণীসেনের বধ পড়িতে পড়িতে দিদি কাঁদিয়া ক্ষণকালের জন্য পড়া বন্ধ করিতেন, আমরাও কাঁদিয়া চক্ষু মুছিয়া লইতাম। এখন ভাবি, আমি তখন তিন চার বছরের শিশু, কিন্তু কৃত্তিবাস এমন ভাষায় রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, এবং পরবর্ত্তী নকলকারীরা তাঁহার সহজ ভাষাকে কালে কালে এমনই সহজ করিয়াছিল—যে আমি তখনই তাঁহার বেশীর ভাগ লেখাই বুঝিয়াছি—যেটুকু বুঝি নাই—তাহা কল্পনা আরও উজ্জ্বল সুন্দর করিয়া দেখাইয়াছে।

দিদির মুখে বৈষ্ণব গান শুনিয়া আমি যে আনন্দ পাইতাম - বোধ হয় কোন কীর্ত্তনীয়ার মুখে গান শুনিয়া সে আনন্দ পাই নাই। শিশুর কোমল হৃদয়ে প্রথম-জীবনের প্রভাব অপূর্ব্বরূপে কাজ করে। আমার মনে হয়, শৈশবে যে সকল বিষয় লইয়া আমরা আনন্দ লাভ করিয়া থাকি, যৌবনে তাহাই আমাদিগকে উদ্দীপনা প্রদান করে—এবং তাঁহারই ব্যাখ্যা করিয়া আমরা শেষ জীবন কাটাইয়া থাকি। এই শৈশবই জীবনের প্রথম ক্ষেত্র, তখন যে সকল বীজ বপন করা হয় - দুঃখের হউক সুখের হউক —শেষকালে সেই বীজ সঞ্জাত ফসলই আমাদের ভাগ্যে ফলিয়া ওঠে।

সুতরাং যখন বিশ্বম্ভর সাহার স্কুলে পড়িতে গেলাম, - তখন রামায়ণ ও মহাভারতের কতক কতক অংশ আমার কণ্ঠস্থ। বিশ্বম্ভরের এক পা খোঁড়া ছিল—আমরা কলার পাতে লিখিতাম, - বাড়ী হইতে কতকটা কলার পাতা ও একটা খাগের কলম ও দোয়াত সঙ্গে লইয়া যাইতে হইত। আর একটা পত্রে খানিকটা বালি থাকিত, উহা ব্লটিং কাগজের কাজ করিত। দোয়াতগুলি মাটির ছিল, তাহা সাধারণতঃ ত্রিকোণ হইত; প্রত্যেক কোণে একটি করিয়া ছিদ্র থাকিত, সেই ছিদ্র-পথে সূতা গলাইয়া একটা শিকের মত তৈরী করিয়া দোয়াতটি ঝুলাইয়া লইয়া যাইতাম। দোয়াতের মধ্যে খানিকটা নেকড়া থাকিত, কালী চলকে উঠিয়া পড়িয়া যাইতে পারিত না। খাগের কলম সকলেই কাটিতে পারিত না, এক একজনের এ বিষয়ে অশিক্ষিত-পটুতা ছিল, সেই সকল শিল্পীদের নিকট উমেদারী করিয়া কলম কাটিয়া আনিতাম। আমি এ বিষয়ে কখনই দক্ষতালাভ করিতে পারি নাই। খাগের কলম এবং কিছু দিন পরে হংসপুচ্ছ কাটিতে যাইয়া আমি প্রায় সর্ব্বদাই গোড়া হইতে আরম্ভ করিয়া শেষ পর্য্যন্ত কাটিতে কাটিতে সাবাড় করিয়া ফেলিতাম।

বিশ্বম্ভর সাহা খোঁড়া হওয়ার দরুণ পা ততদূর না চলিলেও হাত খুব বিলক্ষণই চলিত। তিনি যখন ঠাট্টা তামাসা করিতেন, তখন যেমন পাঠশালা ঘর তরুণ কণ্ঠের হাসিতে উচ্ছসিত মুখরিত হইয়া উঠিত, তেমনই আবার যখন মা'র-ধর সুরু করিয়া দিতেন, তখন কান্নার কলরবে পাড়া অস্থির হইয়া উঠিত। আমাদের পড়ার বই ছিল—"শিশু বোধক" এই কল্পতরুর নিকট চতুর্বর্গ ফল পাওয়া যাইত। 'নামতা' 'কড়াকিয়া' হইতে দাতাকর্ণের কবিত্ব, 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' হইতে স্ত্রী ও স্বামীর পত্র লেখার সেই অপূর্ব্ব ধারা "শ্রীচরণ সরসী, দিবানিশি সাধন-প্রয়াসী মালতী মঞ্জরী দেবী ও "শীতান্তে নিতান্ত সংযোগ" প্রভৃতি বিরহীর প্রাণের আকাঙ্ক্ষা-জ্ঞাপক নানা কথা আমরা একটি শব্দমাত্র না বুঝিয়া মুখস্থ করিয়াছি। কিছুমাত্র ত্রুটি হইলে আমাদের দেশ-সুলভ মোটা বেতের আঘাতে পৃষ্ঠদেশ কণ্টকিত হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের এনসাইক্লোপিড়িয়ার এই ক্ষুদ্র সংস্করণে পূর্ব্বোক্ত অধ্যায়গুলি ও বিরহী-বিরহিনীর পত্র-ব্যবহার ছাড়া দাখিলা, আদালতে আরজি ও পিতার নিকট পত্র লেখার ধারা লিপিবদ্ধ ছিল। এই পুস্তক পড়া শেষ করিয়াই অনেক পড়ুয়া কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতেন—তাঁহারা কেহ হইতেন গ্রামের পাটোয়ারী—তসিলদার। এমন কি কেহ কেহ পঞ্চায়েতের সর্দ্দার হইতেন। এই শিক্ষার বলে কিছু-তেই আটকাইত না। এই পুস্তকের যে কাট্তি কত ছিল, তাহা লং সাহেবের ক্যাটালগ পড়িয়া হিসাব করিলে দেখা যাইতে পারে।

বিশ্বম্ভরের পাঠ-শালায় চারুপাঠ দ্বিতীয়ভাগ পর্য্যন্ত পড়া শেষ করিয়া আমি মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। বিশ্বম্ভরের নিজে পড়া-শোনার দৌড় ঐ চারুপাঠ পর্য্যন্তই ছিল—এমন কি চারুপাঠের শেষ পর্য্যন্ত অনেকটা তিনি নিজেই ভাল বুঝিতেন না—এজন্য উচ্চ ক্লাসের পড়ুয়ারা ঠকাইবার ইচ্ছায় যখন তাহাকে বিরক্ত করিত—তখন একদিকে

তিনি দমাদম কিল, চড় ও বেত মারিতে থাকিতেন, এবং অপর দিকে কঠোর শাসনসূচক রহতর গালাগালি মুখ হইতে নিষ্ঠিবনের সঙ্গে অজস্র বাহির হইতে থাকিত। তিনি একাই যেন সব্যসাচী;—স্বীয় শরীরের নিখিলত অস্ত্রশস্ত্র ও বাক্যবাণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া এই ভাবে তিনি বিদ্রোহ নির্ব্বাণ করিয়া ফেলিতেন। অভয়শঙ্কর সেন মহাশয়ের বাড়ীর বাহিরে আটচালা ঘরটা বিশ্বম্ভরের এই লীলাভূমি ছিল। আমি ত্রিশ বৎসর পরে ১৯১৮ সনে সেই আটচালা ঘরের পড়ন্ত অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছি; সাত বৎসরের শিশু তখন পঞ্চাশ বৎসরের বৃদ্ধ।

মানিকগঞ্জে স্কুলে প্রথম যখন প্রবেশ করি, তখন প্যারীমোহন বাবু ছিলেন, হেড মাষ্টার; বাহিরে নিরীহ ভাল মানুষ বলিয়া তাঁর খ্যাতি ছিল, কিন্তু ছেলেদের ছিলেন তিনি কালান্তক যম। তিনি সহজে রাগিতেন না, শীত গ্রীষ্মে একটা ছিন্ন তালি দেওয়া নীল রঙ্গের র‍্যাপার গায় দিয়া চেয়ারের উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া অনেকটা সময়ই ঝিমাইতেন। কিন্তু লঙ্কাধিপের দ্বিতীয় সহোদর প্রতিম এই মহাত্মার যখন নিদ্রাভাব ঘুচিয়া চক্ষের রক্তবর্ণ ফুটিয়া উঠিত—তখন যে ছাত্র কোনরূপ ত্রুটি করিয়াছে—তাহাকে শুধু-হাতে বিষম প্রহার করিতেন তাঁহাকে আমরা বেত ব্যবহার করিতে দেখি নাই। কিন্তু এই রাগের তাণ্ডব বৎসরের মধ্যে দুই একবার হইয়াছে মাত্র। আমাদের সহাধ্যায়ী উমাচরণ ছিল, কোর্ট ইন্‌স্পেক্টর শ্যামাচরণ গাঙ্গুলীর পুত্র। উমাচরণ অতি দুষ্ট ছিল, একদিন প্যারীবাবু তাহাকে ধরিয়া টেবিলের পায়ের সঙ্গে চাদর দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন—এবং উৎপাতের শান্তি হইল মনে করিয়া পা দুখানি বিশ্রামের ভাবে টেবিলের নীচে চালাইয়া দিয়া ঝিমাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন—কিন্তু উমাচরণ তাঁহার শ্রীপদযুগলে এমনই হেঁচরাইয়া দিয়াছিল যে, পা হইতে বেশ খানিকটা রক্ত বাহির হইয়া গেল।

সেই দিন তাঁহার ঘুম একবার ভাঙ্গিয়া গিয়া স্কুল গৃহকে তিনি রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই দাসোড়া গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্রসেন মহাশয় আমাদের স্কুলের হেড মাষ্টার হইয়া আইসেন। ইনি জীবনে প্রথম ব্রাহ্মমতাবলম্বী ছিলেন। ইনি জীবিত আছেন, বয়স প্রায় পঁচাত্তর হইবে—এখন তিনি গোঁড়া হিন্দু। তাঁহার স্কুলে আবির্ভাব হওয়ার পর প্যারী বাবু দ্বিতীয় শিক্ষক হইলেন—ইতিপূর্ব্বে ছেলেরা এই স্কুলের অধ্যাপকগণের নামে যে ছড়া বাঁধিয়া তাঁহাদের গুণ-গরিমা অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছিল—তাহা আমার বেশ মনে আছে—সেটি এই :—

* * মাষ্টারের বড় রাগ।
সদাই যেন নেকৃড়ে বাঘ॥
* * মাষ্টার সিন্ধু ঘোটক
সাত পুরুষে তার নাই চটক।
* * * পণ্ডিত অতি কুড়ে,
সদাই থাকেন চেয়ার জুড়ে।
* * * * অতি চাষা,
ঐ পাড়ে তার ভাঙ্গা বাসা।"

"ঐ পাড়ে" শব্দ বিশেষ অর্থ-বোধক,—মাণিকগঞ্জ মহকুমার নিম্নে একটা খাল বহিয়া গিয়াছে। সেই খালের পশ্চিম পাড়েই অধিকাংশ অধিবাসীর বাস—"ঐ পাড়ে" অর্থ ভিন্ন পাড়ে—পূর্ব্বদিকে।

পূর্ণচন্দ্র সেন একটু রাগী ছিলেন। প্যারী বাবুর ন্যায় তিনি বছরের

মধ্যে ছুএকবার রাগিতেন না, অনেক সময় রাগিয়াই থাকিতেন, ছেলেরা তাঁহাকে বড়ই ভয় করিত। একটুকু অতিরিক্ত ক্রোধ ভিন্ন তাঁহার আর সকলই সদ্‌গুণ ছিল। দীর্ঘ, গৌরবর্ণ মুর্ত্তি, প্রশস্ত কপাল, চক্ষু দুটি জ্যোতির্ম্ময়, কথা খুব তাড়াতাড়ি বলিতেন না—আস্তে আস্তে থমকে কথা বলতেন—কিন্তু যাহা বলিতেন—তাহা গাঢ় অনুভব ব্যঞ্জনা করিত; তিনি প্রায়ই হেমবাবুর কবিতা ক্লাসে পড়িয়া শুনাইতেন। কবিতা পড়িবার সময় এমনই ধীরভাবে প্রতিটি কথার উপর জোর দিয়া পড়িতেন, যে শিশু-শ্রোতাদের মনে যেন ছাপ পড়িয়া যাইত। তাঁহার কাছে ইংরেজী প্রথম শিখিয়াছিলাম। দুই চার মাসের মধ্যে তিনি ইংরাজী ব্যাকরণের সূত্র আমাদের এমন বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, যে তাহার পরে ব্যাকরণের খুব বেশী শিখিবার ছিল না। সভা হইলে তিনি প্রায়ই নীরব থাকিতেন—কারণ বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পর-সময়ে তিনি মাণিকগঞ্জে সর্ব্বপ্রধান উকিল হইয়াছিলেন—তাহা বক্তৃতার ছটায় নহে। যেমন করিয়া তিনি আমাদিগের মনে কবিতার ছাপ মারিয়া দিয়াছিলেন, ইংরাজী ব্যাকরণের সূত্র গাঁথিয়া দিয়াছিলেন, অল্প কথায় সেই ভাবে তিনি হাকিমকে তাঁর মক্কেলের জোরের কথাগুলি এমনই বুঝাইয়া দিতেন, যে প্রতিপক্ষের উকিলের ওজস্বিনী ভাষায় হাকিমের পূর্ব্বসংস্কার কিছুতেই টলিত না। তিনি যদি জানিতে পারিতেন—মক্কেলের মোকদ্দমা মিথ্যা, তবে কিছুতেই সে মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিতেন না।

পূর্ণবাবুর চরিত্র অতি বিশুদ্ধ—তাঁহার মত বৈষ্ণবশাস্ত্রের বোদ্ধা বঙ্গদেশে খুব কমই দেখিয়াছি। আমার যখন বার বৎসর বয়স, তখন আমি তাঁহার কাছে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের পদের ব্যাখ্যা প্রথম শুনিয়াছিলাম, তিনি প্রথম বিদ্যাপতির এই পদটি আমাকে পড়িয়া শুনাইয়াছিলেন।

"কানুমুখ হেরইতে ভাবিনী রমণী।
ফুকরই রোয়ত ঝর ঝর নয়নী॥
অনুমতি মাগিতে বরবিধু বদনী।
হরি হরি শবদে মুরছি পড়ে ধরণী॥
বুঝায়ে কহয় তবে নাগর কান।
হাম নাহি মাথুর করব পয়ান॥
ইহবর শবদ পশিলু যবে শ্রবণে।
তব বিরহিনীধনি পাওল চেতনে॥
নিজ করে ধরি দুঁহু কানুক হাত।
যতনে ধরল ধনি আপনাক মাথ॥"

কৃষ্ণ যে উপন্যাসের নায়ক নহেন—স্বয়ং ভগবান এবং রাধা যে সাধারণ প্রণয়িণী নহেন—ভগবৎ প্রেমানন্দের স্বরূপ, তিনি সেই দিনই আমাকে তাহা এমন করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—যে তাঁহার মুখোচ্চারিত ব্যাকরণের সূত্র যেরূপ আমার চিত্তে খোদিত হইয়া গিয়াছিল—সেই ভক্তিব্যাখ্যাও আমার মনে সেইরূপই হইয়াছিল—আমিকখনই রাধাকৃষ্ণ-সম্বলিত পদাবলী সামান্য নায়ক-নায়িকার প্রেমোপাখ্যানের মত আর পড়িতে পারি নাই। তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন, বিদ্যাপতির ভাব-সম্মিলন অর্থ শরীরের মিলন নহে; উহা হৃদয়ে ভগবৎসত্বার অনুভূতি; এজন্য সেই মিলনের উপচার ও অভ্যর্থনা কিছুই বাহিরের নহে; দেহ ভগবানের মন্দির, এবং সেই মন্দিরেই তাঁহার অভ্যর্থনার বেদী—

পিয়া যব আয়ব এ মঝু গেহে।
মঙ্গল আচার করব নিজ দেহে॥

বেদী করব হাম আপন অঙ্গমে।
ঝাড়ু করব তাহে চিকুর বিছানে।
আলিপনা দেওব মতিম হার।
মঙ্গল কলস করব কুচভার॥

বাহিরের আলিপনা দেওয়া নহে; বক্ষে তাহার জন্য বেদী তৈরী হইল, মুক্তাহারেই সেই আলিপনা হইবে। স্তনদ্বয় মঙ্গলঘটস্বরূপ হইবে, এবং উন্মুক্ত সুদীর্ঘ কেশদাম দ্বারা ঝাঁটা প্রস্তুত করিয়া সেই বেদী পরিষ্কার করা হইবে। এখানে যিনি আসিতেছেন, তিনি বাহিরের পথ দিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে আসন গ্রহণ করিবেন না, এই দেহের মন্দিরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হইবে—সুতরাং এই দেহেই সমস্ত মঙ্গল আচারের ব্যবস্থা হইতেছে।

পূর্ণবাবুর গভীর ভক্তি আমাদিগকে এই সংশিক্ষা দিয়াছিল। কিন্তু তখনও তিনি ব্রাহ্ম মত একবারে ছাড়েন নাই। কেশব বাবু যখন ভগবৎ-প্রেরণার দোহাই দিয়া কন্যা-বিবাহের আয়োজন করিতেছিলেন এবং "Am I not an inspired prophet?" বক্তৃতা দিয়া কলিকাতার টাউন হল কাঁপাইতেছিলেন, তখন এই ধর্ম্মনিষ্ঠ পল্লীযুবক তাঁহার শিশু-শ্রোতাদিগের নিকট অনেক সুগভীর পরিতাপসূচক আন্তরিক আক্ষেপোক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি পিতৃদেবের সঙ্গে এ সম্বন্ধে প্রায়ই আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার স্বকৃত "সত্যব্রতের পরীক্ষা" নামক কাব্য গ্রন্থের একস্থানে লিখিয়াছিলেন,

"মৃৎস্তূপে বসিয়া যথা রাখাল বালক
গম্ভীর ভঙ্গীতে করে রাজাজ্ঞা প্রচার
বেদীর উপরে বসি তথা ছন্নমতি
ঈশ্বরোপলক্ষে করে আপনা প্রচার।"

এই 'ছন্নমতি' কেশবচন্দ্র সেন,—এবং এই 'ছন্নমতি' কথাটায় এটি বুঝাইতেছে, যে কেশব বাবুর অত্যন্ত বিরুদ্ধ হইলেও পূর্ণ বাবু তাঁহাকে প্রতারক মনে করেন নাই।

মাণিকগঞ্জ স্কুলে পূর্ণবাবুর প্রভাব আমরা খুব বেশী অনুভব করিয়াছিলাম। আমরা একত্র পড়িতাম—প্রসন্নগুহ, কেদার বসু, অবিনাশ, দুর্গাকান্ত ও আমি। প্রসন্নগুহ খোলা মন,—উদার চরিত্র। কেদার সেই বয়সেই কতকটা বৈষয়িক—ক্ষীণ দেহ। অবিনাশ ধীর গম্ভীর,শান্তশিষ্ট, মেয়েদের "ভাল ছেলে।" দুর্গাকান্ত নেহাৎ গো-বেচারী—আমরা বাজারের কাছে খোলা মাঠে ব্যাটবল খেলিতাম। আমাদের সঙ্গী আরও দুইজন ছিল—হেম নেউগী ও শশী নেউগী, ইহারা একটু নীচের ক্লাসে পড়িত, কিন্তু খেলায় আসিয়া যোগ দিত। শশী আমাদের অপেক্ষা বয়সে একটু ছোট ছিল, তাহার চোখদুটি হরিণের মত ছিল, এজন্য আমরা তাকে "হরিণ শিশু" বলিয়া ডাকিতাম। প্রসন্ন গুহ ও আমি গলায় গলায় থাকিতাম, আমাদের এত ভাব ছিল। তাদের ও আমাদের বাসাবাড়ী অতি কাছাকাছি ছিল, তার মায়ের সঙ্গে আমার মায়েরও খুব ভাব ছিল। উভয়ে এক হইলে কত ঘণ্টা সুখ দুঃখের গল্পে কাটিয়া যাইত; প্রসন্নের মায়ের চেহারা ছিল শ্যামবর্ণ, তাঁহার একটা লক্ষ্মীশ্রী ছিল, সুরটি ছিল স্নেহময়, তিনি সকল ছেলেরই মায়ের মতন ছিলেন। একটা সোনার হার সর্ব্বদা গলায় পরিতেন, কামরাঙ্গার ডিকস্ এডিসন হ'লে যেরূপ হয়, তেমনই সোনার দানা দিয়ে সেই হার গড়া হইয়াছিল, পল উঠানো ছোট ছোট বাদামের মত। প্রসন্নের ছোট ভাই গগন (অভয় গুহ) সম্প্রতি কলিকাতা হইতে পি, এচ, ডি উপাধি লাভ করিয়া অধ্যাপকের কাজ করিতেছেন।

প্রসন্ন ও আমি সর্ব্বদা একত্র থাকিতাম, খাইতে বসিতে—ঘুরিয়া

বেড়াইতে অবিরত সে আমার সঙ্গী। বিধাতা আমাদের গান গাহিবার শক্তি দেন নাই, তবুও আমরা দুজনে গানের যে বিকট চেষ্টা করিতাম, তাহাতে নূতন পুকুরের দুই ধারের প্রান্তরভূমি যেন সত্যসত্যই ভয়ে কাঁপিয়া উঠিত। দুজনে একত্র পূর্ণবাবুর হাতে কিল চড় খাইয়া মানুষ হইয়াছি। সে এখন ময়মনসিংহের জজ আদালতের একজন ভাল উকীল—প্রসন্ন স্বর্গীয় রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর, বিদ্যা-সাগর, সি আই, ই মহাশয়ের এক কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিল।

আমাদের দলের কেদারনাথ বসু মাইনর পাশ করিয়া আর বেশী উঠিতে পারে নাই। সে মোক্তারী পাশ করিয়া মাণিকগঞ্জেই মোক্তারী করিত, তাহার পশার সকলের চাইতে ভাল হইয়াছিল। একদিন গিরীশ পণ্ডিত তার মাথায় চড় মারিয়াছিলেন। সে সেইদিন পণ্ডিত মহাশয়কে যেরূপ ধমক দিয়াছিল, তাহা আমি এখনও পর্য্যন্তও ভুলি নাই। পণ্ডিতের দিকে ক্রুদ্ধনেত্রে চাহিয়া সে বলিল, "পণ্ডিত মহাশয় ব্রহ্ম-তালুতে চড় মারূছেন কেন? আর কি জায়গা নাই। দমাদম পিঠে মারুন না কেন? আমার মাথার অসুখ—আর আপনার একটা কাণ্ড জ্ঞান নাই?"

সেকালের মাষ্টার পণ্ডিতদের যে মারধর সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞানের অভাব ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। হাতী দেখিতে উকিমারার অপরাধে পূর্ণবাবু আমার নাকটা ধরিয়া এমন মলিয়া দিয়াছিলেন, যে পাঁচ ছয়দিন আমার নাকের ডগাটা টকটকে লাল হইয়াছিল।

দুই তিন বছর হ'ল কেদার মারা গিয়াছে। আমাদের সেই সময়ের আর দুই বন্ধু মাণিকগঞ্জবাসী আজাহার ও তফিরুদ্দি উভয়েই মারা গিয়াছে। আজাহার ঐ সব্‌ডিভিসনে মোক্তারীতে খুব পশার জমাইয়া হঠাৎ সাত আট বৎসর হইল মারা পড়িয়াছে। আজাহার দেখ্‌তে বড়

সুপুরুষ ছিল। মরিবার এক বছর পূর্ব্বে সে কলিকাতায় আমার বাসায় হঠাৎ বাড়ীর মধ্যে চলিয়া আসে। আমি প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর তাহাকে দেখি নাই, কালোকুঞ্চিত কেশদামের পরিবর্ত্তে এলোমেলো সাদা-কাঁচা চুল, দোহারা ক্ষীণ-কটি তরুণ মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে বেশ মোটাসোটা, হৃষ্টপুষ্ট ভুরিওয়ালা চেহারা,—রঙ্গের সে ঔজ্জ্বল্য নাই, ফর্শা ছিল—সেই ফর্শা রং যেন বেগুণে রঙ্গের বাটীতে গুলিয়া মাখান হয়েছে—কি করিয়া চিনিব? "কে আপনি? এ যে বাটীর ভেতর" বলিয়া হঠাৎ রুক্ষস্বরে কথা বলিতে যাইয়া দেখিলাম, তাহার সঙ্গে সতের আঠার বৎসরের এক তরুণ সদ্য-যৌবন সুদর্শন মূর্ত্তি! লুপ্তস্মৃতির পুনরুদ্ধারের ন্যায় এই তরুণ যুবককে বিশেষ পরিচিত বলিয়া মনে হইল; আমি সেই বালককে দেখিয়া পঁয়ত্রিশ বৎসরের ব্যবধান ভুলিয়া গিয়া বলিলাম "আজাহার নয় কি?" প্রৌঢ় আমায় বলিল "ওটি আজাহার-তনয়, এই আমি হচ্ছি আজাহার, তোমাকে এই বাড়ীর মালিক বলিয়া না জানিলে কখনই বুঝিতে পারিতাম না, তুমি সেই দীনেশচন্দ্র, একবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছ।"

তাহার ছেলে ম্যাট্রীকুলেশন পাশ হইয়াছে, তাহাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি করিতে সে নিজে এসেছে। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহাকে ভর্ত্তি করাইয়া দিলাম। আজাহার বলিল "দেখতে মোটা দেখ্‌ছ, আমার শরীরটি একটি ব্যাধি মন্দির, একজন ভাল ডাক্তারের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দাও।" ডাঃ সতীশচন্দ্র বরাটের উপর তাহার ভার দিলাম। কয়েক মাস ঔষধ ব্যবহার করিয়া একটু ভাল ছিল—তার পরে শুনিলাম—সে মাণিকগঞ্জে হঠাৎ মারা পড়িয়াছে।

আমাদের খেলার সাথী সেই "হরিণশিশু" শশী নেউগী জলপাইগুড়ি জজ আদালতের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল হইয়াছিল। সেও আজ দশ বার বৎসর হইল মারা গিয়াছে। তাহার ভাই হেম নেউগী সবজজ হইয়া

বোধ হয় এতদিন পেন্সন নিয়া থাকিবে। দুর্গাকান্ত রায় হাওড়ায় সব-জজিয়তি করিতেছে।

মাণিকগঞ্জ স্কুল হইতে আমরা পাঁচজন মাইনর পরীক্ষা দিয়াছিলাম ইংরাজি ১৮৭৯ সনে। তার মধ্যে আমি, কেদার, প্রসন্ন ও দুর্গাকান্ত থার্ড ডিভিশনে পাশ হইয়াছিলাম। অবিনাশ ফেল হইয়াছিল। পূর্ণ বাবু বলিতেন আমি ইংরেজীতে ভাল, কিন্তু অঙ্কে আমার মাথা খেলে না, সেই কথাই বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইয়া, এবঞ্চ তাহাতে কতকটা গৌরব মনে করিয়া, সাহিত্যই পড়িতে আরম্ভ করি—এবং গণিতকে তুচ্ছ করি,—তাহার ফলে সত্যই আমি গণিতে কাঁচা রহিয়া গেলাম, কিন্তু এখন মনে হয়—আমি পড়িলে গণিত আয়ত্ত না করিতে পারিতাম এমন নহে।

এই মাইনর পরীক্ষায় একটা বিভ্রাট হইয়াছিল। ইংরেজী পরীক্ষায় যে ছেলে মাণিকগঞ্জ স্কুলে সর্ব্বোচ্চ নম্বর পাইবে—তাহার সেই বৎসর একটা রৌপ্য-পদক পাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমি ইংরেজিতে ভাল ছিলাম—সুতরাং উক্ত পদকটি যে আমার প্রাপ্য ছিল—তাহা সকলেই জানিতেন এবং আমিও পূর্ব্বসিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কয়েক মাস পরে ইন্‌স্পেক্টর আফিসে অনুসন্ধান হইলে জানা গেল আমার ইংরেজীর কাগজখানি খোওয়া গিয়াছে। অথচ আমি মাইনর পাশ হইয়াছি। সেকালে মোট নম্বরের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ রাখিলেই পাশ হওয়া যাইত—সুতরাং ইংরেজীতে শূন্য পাইয়াও আমি পাশ হইয়াছিলাম। বাবা যখন এ বিষয় লইয়া লেখালেখি করিতে লাগিলেন, তখন আর কোন ফল হইল না। আমি যে ইংরেজী কাগজ দিয়াছিলাম, তাহা প্রমাণিত হইতে বিলম্ব হইল না—কিন্তু ইনেস্পেক্টর সাহেব দুঃখ করিয়া লিখিলেন—অনুসন্ধানটা খুব দেরীতে

হইয়াছে—তখন আর এ বিষয়ে কোন প্রতিকারের উপায় ছিল না। বাবা লিখিলেন যদি ইংরেজীতে শূন্য পাইয়াও মাইনর পরীক্ষা পাশ করা যায়, তবে মাইনর ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় কি তফাৎ থাকে? ফলে সেই বৎসর নূতন আইন হইল যে মাইনর পাশ করিতে হইলে ইংরেজীর পরীক্ষায় একটা নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক নম্বর থাকা প্রয়োজন।

মাইনর পরীক্ষা পাশ হইবার পূর্ব্বেই আমার দ্বাদশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। আমার শ্বশুর উমানাথ সেন কুমিল্লা কলেক্টরীতে হেড ক্লার্ক ছিলেন, তাহার পিতা সেখানে সর্ব্বপ্রধান মোক্তার ছিলেন, এবং সেইখানেই আমার পিতার মাতুল চন্দ্রমোহন দাস (যাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে বিস্তারিতভাবে লেখা হইয়াছে) ওকালতি করিতেন। মাণিকগঞ্জ স্কুলের শেষ সীমা অতিক্রম করার পর—পিতা আমাকে কুমিল্লায় পাঠাইয়া দিলেন।

তখন আমাদের সংসারে দৈন্য ও রোগ ঢুকিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রসিদ্ধ সভার ও তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম মাণিকগঞ্জ মহকুমা হইতে সরাইয়া লইয়া ঢাকার সদরের অন্তর্গত করা হইয়াছে। সাভার ধনী বণিকগণের একটা কেন্দ্র ছিল, এবং এই স্থানের সকল মোকদ্দমাই বাবা পাইতেন,—ঐ গ্রাম এবং তন্নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম বাবার হাতছাড়া হওয়াতে তাঁহার পসার অত্যন্ত কমিয়া গেল—এই সময়ে বাবা বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হন, এবং তাঁহার দুইটি চোখেই ছানি পড়ে। আমাদের নানারূপ কষ্ট উপস্থিত হয়।

মা বড় কষ্টে আমাকে একাকী দূর কুমিল্লায় ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন। আমার শিক্ষার উন্নতিকল্পে সর্ব্বদাই মা অতি দৃঢ়চেতা ছিলেন। তাঁহার মত স্নেহময়ী—ত্যাগ-পরায়ণা রমণী আমি খুব কমই দেখিয়াছি। তাঁহার সমস্ত আবদার ও বিরোধ ছিল আমার পিতার সহিত, কিন্তু

অপর সকলের সঙ্গে তাঁহার কোন আবদারই ছিল না। যাহাকে তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে চোখে হারাইতেন, তাহাকে তিনি কৈশোরে সাত দিনের পথ দূরে পাঠাইয়া বৎসর ধরিয়া যে কি উৎকণ্ঠায় থাকিতেন, তাহা আমি এখন বুঝিতে পারি। ইহার পর যখন আমি ঢাকায় পড়িতাম, তখন ছুটিতে আমি বাড়ী আসিয়া ছুটি ফুরাইলে একটি দিন ও বেশী বাড়ী থাকিতে পারিতাম না। আমার পড়ার কোন বিঘ্ন হইলে তিনি আমায় ক্ষমা করিতেন না। তাঁহার এই ব্যবহার আমার নিকট নির্ম্মম বোধ হইত। কিন্তু তাঁহার একমাত্র পুত্রের প্রতি অদম্য স্নেহ-প্রবাহকে যে তিনি কিরূপ সংযমের রাস ধরিয়া ঠেকাইয়া রাখিতেন—তাহার মধ্যে পুত্রের ভবিষ্যতের শুভ চিন্তা কতটা প্রভাব বিস্তার করিত—তাহা ভাবিয়া দেখিলে, তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোক হইতে অনেক উচ্চ স্থানে আসন দিতে হয়। আমি যখন ঢাকায় পড়িতাম, তখন যে আত্মীয়ের বাড়ী ছিলাম, তিনি প্রায়ই আমাকে অযথা কষ্ট দিতেন এবং তাঁহার আশ্রিত অপরাপর আত্মীয় বালক অপেক্ষা আমাকে অবহেলার চক্ষে দেখিতেন, আমাকে দিয়া অনেক ফরমাইস খাটাইতেন এবং প্রায়ই এ ছুতো ও ছুতো ধরিয়া গালমন্দ দিতেন। আমি তাঁহার বাড়ীতে চোরের মত থাকিতাম, তাঁহার ছেলেদের সঙ্গে স্ফূর্ত্তি করিয়া খেলিতে সাহস পাইতাম না। যখন উৎকট শারীরিক পরিশ্রমের দরকার হইত, তখন সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইলেও সেই কাজের জন্য আমারই ডাক পড়িত। ছয় সাত মাস পরে ছুটিতে বাড়ী আসিতাম। আমার প্রকৃতি নীরব ও সহিষ্ণু ছিল; বহু মনের কষ্ট আমি মুখ ফুটিয়া বলিতাম না। কিন্তু একদিন আমি নীরব রাত্রিতে ঝিল্লি-নাদিত প্রকৃতির নিতান্ত আড়াল পাইয়া মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিয়া আমার মনের দুঃখ তাঁহার কাছে বিনাইয়া বিনাইয়া বলিয়াছিলাম।

মা আমাকে দৃঢ়ভাবে বলিলেন "ছিঃ! খোকা—তুই বড় তুচ্ছ কথা বড় করিয়া দেখিস্। সে (আমার আশ্রয়দাতা আত্মীয়) কেন এমন করিতে যাইবে? এ তোর বুঝবার ভুল! আর যদি দুই একটা কাজে সে তোকে লাগায়, তা করতে অপমান কি? গুরুজনের সেবায় পুণ্য হয়। তাই ভেবে সে সকল কাজ করিস্। তুই কি সে বাড়ীর চাকর যে নিজকে এত হীন মনে কচ্ছিস্?" এমনই দৃঢ়ভাবে তিনি কথাগুলি বলিলেন যে আমার সমস্ত আক্ষেপ অধরে মিলাইয়া গেল—সমস্ত অশ্রু চক্ষে শুকাইয়া গেল; বৃন্তচ্যুত ফুল যেরূপ আশ্রয় লাভের ব্যাকুলতায় পাথরে আছড়িয়া পড়ে, আমি মায়ের নির্ম্মম অন্তঃকরণের নিকট মাথা খুঁড়িয়া সেইরূপ বিড়ম্বিত হইলাম। তখন মনে বড় দুঃখ হইয়াছিল। এখন বুঝিতে পারিতেছি, মাতা কতটা সংযম দ্বারা নিজের উন্নত সহানুভূতির বাহ্যিক প্রকাশকে রোধ করিয়াছিলেন। তিনি যদি সাধারণ স্ত্রী-সুলভ ব্যাকুলতা দ্বারা আমার কথার প্রশ্রয় দিয়া কান্নাকাটি করিতেন, তবে আমার লেখা পড়ার সুবিধা চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইত—আমি সে বাড়ীতে আর থাকিতে পারিতাম না।

বাবা আমাকে কাছে বসাইয়া উপাসনা পদ্ধতি শিখাইতেন। ঠাকুর-দেবতা যে কিছু নয়, তাহা বুঝাইতেন "একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর—তাঁহার রূপ নাই। ছেলেরা যেমন পুতুল লইয়া ভাবে ইহারাই মানুষ, কাঠ পাথর ও মৃণ্ময় বিগ্রহ লইয়া তেমনই লোকে ভাবে ইহারাই দেবতা। ছেলেরা যেমন পুতুলের বিয়ে দেয়, ইহাঁরা তেমনই পুরাণ রচনা করিয়া এই সকল কাঠ পাথরের মূর্ত্তি সমূহের জন্ম হইতে সুরু করিয়া বিবাহাদি সমস্ত বিষয়ে গল্প রচনা করিয়া পুস্তক লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।" পিতা যখন একা আমায় লইয়া এই সকল উপদেশ দিতেন, তখন মা হঠাৎ ঝড়ের মত ঘরে ঢুকিয়া সমস্ত উপদেশ ওলট পালট করিয়া দিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে পিতাকে

বলিতেন—"ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তুমি ওর মাথাটী খেও না, তুমি জীবন ভরিয়া আমায় এই সকল কষ্ট দিয়ে এসেছ, সাত নয় পাঁচ নয়, আমার একটা ছেলে তাহাকে ও একবারে যাহান্নামে দেওয়ার পথ করিতেছ। এরূপ করিলে আমি তোমার পায়ের কাছে মাথা খুঁড়িয়া মরিব, না হয় গলায় দড়ি দেব। বার মাসে তের পার্ব্বণ করিতে সকল কাজ আমাকে নিজে করিতে হয়। বাড়ীতে দুর্গোৎসব—তাও পুরুৎ ডাকা হ'তে বাজার করার ব্যবস্থা এমন কি বাজনার বন্দোবস্ত ও আমায় করতে হয়। ভেবেছি খোকা বড় হইলে সে এই সকল ব্যাপারে আমার সহায় হইবে—তুমি ওকেও বিধর্ম্মী করিয়া তুলিতেছে!" মায়ের কথার তোড়ে বাবা ভাসিয়া যাইতেন। আমি ইহার পরে প্রহারের ভয়ে আস্তে আস্তে তাঁহার নিকট হইতে উঠিয়া যাইতাম।

আমি যেবার "এফ, এ" পরীক্ষা দিব, তখন ফিলিপ, টি, স্মিথ সাহেব একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন। ইনি ছিলেন "এপিফেনীর" এডিটর। ইনিই এই পত্রিকাখানি প্রথম প্রকাশ করেন। সাহেব আমাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, ১৮৮২ সনের এপিফেনি কাগজে আমার অনেক লেখা বাহির হইয়াছিল। তিনি ঢাকায় আসিয়া শুনিলেন, আমি সুয়াপুর গ্রামে চলিয়া আসিয়াছি। তিনি আমায় লিখিলেন "অক্সফোর্ড মিশনের ব্যয়ে তুমি ঢাকায় চলিয়া আসিয়া আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, নতুবা ব'ল আমি তোমাদের সুয়াপুর গ্রামে যাইব।" বাবা পত্রখানি পড়িয়া খুসী হইয়া বলিলেন "বেশ্ ত সাহেব এ গ্রামে আসুন না, এখানে সভা করিব ও তাঁহাদের সঙ্গে ব্রাহ্ম-মতের পোষকতা করিয়া পাল্লা দিব।" কিন্তু মা এই কথা শুনিয়া বিষম চটিয়া গেলেন—"আমাদের সংসারটা কি ভূতের লীলার স্থান যে ব্রাহ্ম খ্রীষ্টান সকলে মিলিয়া এখানে উৎপাত করিবে? উপলক্ষ তো একটা আধ মরা ছেলে" আমার দিকে ক্রুদ্ধ চক্ষে চাহিয়া বলিলেন—

"খোকা তুই লিখে দে—আমাদের হিন্দু ধর্ম্মের মত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই—আমরা খ্রীষ্টানী মত শুনিতে চাই না।" আমি স্মিথ সাহেবকে লিখিলাম, "আমাদের গ্রামের লোক গোঁড়া হিন্দু,—এখানে আসিলে আপনার ভাল লাগিবে না।"

আমার মাতার ধর্ম্ম সম্বন্ধে মতের উদারতা না থাকিতে পারে—কিন্তু সকল বিষয়েই তাঁহার একটা প্রবল মত ছিল—এবং তাঁহার মতানুসারেই আমাদের চলিতে হইত। পিতা তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস লইয়া যেন কতকটা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিতেন, আমরা পূজার উৎসব ও বার মাস তের পার্ব্বণে হিন্দু ধর্ম্মের জয় ডঙ্কা বাজাইয়া ফিরিতাম।

গৃহে হিন্দু ও ব্রাহ্মমত—

পিতামাতার ও ভগিনীদের মৃত্যু।

আমি ব্রাহ্ম ও হিন্দু—এই দুই শ্রেণীর মধ্যে যাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভাল—তাহা সর্ব্বদা চোখের সাম্‌নে দেখিয়াছি। আমার মাতা, মাতামহ ও বড়দিদি-দিগ্বসনী দেবীর যে ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখিয়াছি, দেবতার পূজায় যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখিয়াছি, তাহাতে মনে হইয়াছে হিন্দুর দেবতারা জীবন্ত। মাতামহ এত বড় তেজস্বী ব্যক্তি ছিলেন—কিন্তু তিনি যখন শুইয়া শুইয়া গাইতেন "আমার মন যদিরে ভোলে। তবে বালীর শয্যায় কালীর নাম দিও কর্ণ মূলে" তখন তাঁহার দুই চক্ষের জল অজস্র পড়িত। যখন তাঁহার বিশাল দুর্গামণ্ডপে অতি বৃহৎ দশভুজা প্রতিমার আরতির সময় পুরোহিত-কর-ধৃত পঞ্চ প্রদীপ ঘুরিতে থাকিত, অগুরু ও ধূপের সুগন্ধে ও ধোঁয়ার মধ্য হইতে অদৃশ্য ও অব্যক্ত রূপের প্রকাশের ন্যায় মুকুট ও অঞ্চলের স্বর্ণবর্ণ ঝলমল্ করিতে থাকিত; কিম্বা পুষ্পপাত্রের ফুল ও চামর সেই বিরাট মূর্ত্তির মুখের নিম্নে দুলিয়া দুলিয়া অরূপকে অপরূপ করিয়া দেখাইত, তখন মাতামহ গললগ্ন উত্তরীয় ও নগ্ন পদে দৈন্য জানাইয়া জোড় হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতেন—দুই গণ্ড ভাসিয়া অশ্রু প্রবাহিত হইত। মা ধন্না দিয়া কাঁদিতে থাকিতেন, কখনও আহার নিদ্রা ছাড়িয়া মন্দিরের দোরে আঁচল পাতিয়া শুইয়া প্রার্থনা জানাইতেন, তখন মাতামহ ও

মাতার আরতি যে বিশ্ব-মাতার কাছে যাইয়া পৌঁছিত - সে সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ ছিল না এবং এখনও নাই। দিদি দিগম্বরী দারুণ যক্ষ্মা কাশী লইয়া শেষ রাত্রে নীচেকার একটা সেঁতসেঁতে ঘরে বসিয়া জপ করিতেন; যখন দাসদের বাড়ীর কুঞ্জ বেহাগ রাগিণী গাইয়া দ্বিপ্রহর রাত্রির অভ্যর্থনা করিয়া ঘুমাইয়া পড়িত, তখন দিদির জপ আরম্ভ হইত এবং প্রভাতের কাক-কলধ্বনির সঙ্গে জপ শেষ করিয়া তিনি স্নানার্থ নদীতে যাইতেন, তথা হইতে আসিয়া একবার আমিষের ঘরে রান্না করিয়া পুনরায় নদীতে স্নান করিয়া নিরামিশ পাকে রান্না করিতেন, খাওয়াদাওয়ার পর আবার জপে বসিয়া রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত জপ করিতেন, অধিকাংশ সময়ই গায়ে 'একশত তিন' জ্বর থাকিত এবং প্রায়ই গলা হইতে রক্ত পড়িত। এ সকল কাজ তাঁহাকে আমরা কেন করিতে দিয়াছি, প্রশ্ন হইতে পারে। তাহার কারণ, তিনি যেটা করিবেন—সেইটি করিবেনই। তিনি জেদ করিয়া বসিলে তাহাকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন—এতদিন এই যক্ষ্মা রোগ লইয়া এরূপ দুশ্চর তপস্যা করিয়া মানুষ যে কি করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, তাহা আমাদের শাস্ত্রে বলে না,—তিনি যে তপস্যা করিতেছেন—সেই তপস্যার শাস্ত্রই এই প্রহেলিকার মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারে।"

একদিকে হিন্দুধর্ম্মের এই জলন্ত বিশ্বাস প্রত্যক্ষ করিয়াছি, অপর দিকে পিতৃদেবতার সৌম্য-দর্শন, শান্ত সমাহিত মূর্ত্তি—জ্ঞানের যেন স্থির প্রদীপ। মন্দিরের আরতি হইতে তাহার প্রভাব ও কম ছিল না। তিনি দিবারাত্রি প্রায়ই উপাসনায় কাটাইয়া দিতেন। তিনি কখনও অসত্য কথা বলিয়াছেন, এমন কেহ বলিতে পারিবেন না। তাঁহার ক্রোধ দেখি নাই, তাঁহার চাঞ্চল্য বা মতের পরিবর্ত্তন দেখি নাই, দুঃখ শোকে তাঁহাকে

ক্ষুব্ধ হইতে দেখি নাই, তাঁহার আমার প্রতি অসীম ভালবাসায় ও কোন উদ্বেল বা উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই নাই, শুধু একদিন তিনি অধৈর্য্য হইয়াছিলেন—আমার মায়ের মুখে শুনিয়াছি। তিনি ভয় করিতেন নদীকে আর সাপকে। সাপের ভয়ে ঘরে ঘরে বড় খাট পাতা থাকিত ও চাঁদোয়া টাঙ্গানো হইত; নানারূপ মসারীর কায়দা করিয়া তিনি তোষকের নীচে রন্ধ্র মাত্র ফাঁক রাখিতে দিতেন না। সেই একদিনের কথা বলিতেছি। নদীতে ঝড়ের সময় নৌকায় থাকিলে তিনি ভয় পাইতেন, কিন্তু ভয়ের কোন বাহ্য-লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া স্থির প্রস্তর-বিগ্রহের ন্যায় বসিয়া উপাসনা করিতে থাকিতেন, তাহার ঈষৎ কম্পিত ওষ্ঠাধর ও অর্দ্ধ নিমীলিত চোখের ভঙ্গীতে যেন বুঝিতাম—'রক্ষা কর', 'রক্ষা কর', এই প্রার্থনা ভাষায় ব্যক্ত না হইয়া ও মনের মধ্যে চলিতেছে। একদিন নৌকায় তাঁহার মুহুরি বিপিন ঠাকুরের সঙ্গে তিনি আমায় ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তখন আমার বয়স চৌদ্দ বৎসর। সন্ধ্যাবেলা প্রবল ঝড় হয়, আমরা ঝড়ের রকম বুঝিয়া একটা চড়ায় নৌকা নঙ্গর করিয়া ফেলি। বৃষ্টি ছিল না, শুকনো ঝড়, আমি ও বিপিন ঠাকুরদা সেই চড়ার ধূলি খেয়ে নৌকায়এসে স্থির হইয়া বসিয়াছিলাম। এরূপ ভারি নোঙ্গর ছিল ও এরূপ শক্ত লৌহের শিকলে তাহা আবদ্ধ ছিল যে নৌকা উড়াইয়া বা ভাসাইয়া লইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। মায়ের কাছে শুনিয়াছিলাম, রাত্রে ঝড় উঠিলে পিতা পাগলের মত হইয়া "আমিই খোকাকে মারিয়া ফেলিলাম, আমার খোকা কোথায় গেল? তাকে কে এনে দেবে?" এইভাবে বহু আক্ষেপ করিয়া সেই ঝড়ের মধ্যে লণ্ঠন লইয়া দুই মাইল দূরে আমার মাতুলালয় বগজুড়ী গ্রামে ছুটিয়া যাইয়া আমার মাতুলদিগের দ্বারা পরদিন অতি প্রত্যুষে ঢাকায় লোক পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া আসেন।

কিন্তু এই দিন ছাড়া আর কখনও তাঁর কোনরূপ ব্যাকুলতা দেখি নাই। আমি একবার রাত্রি নয়টার সময় মাতুলালয়ে ছিলাম, বাড়ি (সুয়াপুর) হইতে তখন এক লোক আসিয়া বলিল—"কর্ত্তা (বাবা) মরণাপন্ন, আপনি এখুনি চলুন।" আমি একটা ঘোড়ায় চড়িয়া সাত আট মাইল পথ অতিক্রম করিয়া বাড়ী আসিলাম। রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নাময়ী, পল্লীগুলি ছিল নিদ্রাবিষ্ট, নিঝুম,—কিরূপ দুর্ভাবনায় মগ্ন যাইতেছিলাম—তাহা বলিয়া উঠা কঠিন। তখন জ্যৈষ্ঠমাস,—বেশ সুখকর বায়ু বহিতে ছিল—কিন্তু আমার মনের মধ্যে ছিল হাহাকার।

ঘোড়ার বেগ শিথিল করিয়া রাত্রি প্রায় বারটার সময় বাড়ী পৌঁছিলাম, গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বাবা তাকিয়ায় ঠেস্ দিয়া বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া বলিলেন "একটা crisis, (বিপদের অবস্থা) এসেছিল, দক্ষিণা (ডাক্তার, আমার ভগিনীপতি) এতক্ষণ ছিল, সে বলিয়া গিয়াছে বিপদ কেটে গেছে।" তখন তিনি স্থির-ভাবে বসিয়া উপাসনা করিতেছিলেন। আমার মনে যখনই তার কথা মনে হয়, তখনই তাঁহার সেই সৌম্য উপাসনার মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে,—"ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং" এবং বয়ং তং স্মরামঃ বয়ং তং ভজামঃ বয়ং তং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ" মহা-নির্ব্বাণ তন্ত্রের এই পরিচিত শ্লোকগুলি তাঁহার উপাসনার মন্ত্র ছিল। এই গুলি অর্দ্ধস্ফুট স্বরে আবৃত্তি করিয়া তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিয়াছেন—এই শ্লোকগুলি যেন তাঁহার পক্ষে আশ্রয়ের অটল হিমালয়, এখানে পৌঁছিলে, যেন তিনি একেবারে অনড়, বিপদাতীত ও সম্যক্ নিরাপদ্ হইয়া যাইতেন।

কখনও দেখিয়াছি অতি প্রত্যুষে তিনি ফুলের বাগানে বেড়াইতে

বেড়াইতে মৃদু স্বরে গাইতেছেন, "মন চল নিজ নিকতনে।" তাহার প্রতিটি কথায়, প্রতিটি সুরে যেন সেই "নিজনিকেতনের" শান্তির প্রতি ইঙ্গিত করিত। শেষ জীবনে "ইন্দ্রিয় দশ, হইতেছে অবশ, ক্রমেতে নিশ্বাস যায় ফুরিয়ে" এই গান গাহিয়া নিত্যধামের যাত্রী হইতে যে তাঁহার বিলম্ব নাই, এই বুঝাইতেন। শেষ কালটায় বাউলের গানের প্রতি তাঁহার একটা নেশা হইয়াছিল। আমাদের আঙ্গিনায় নালু গয়লা, কোকা, হরি সাহা প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় লোকেরা লম্বা লম্বা গৈরিকবর্ণের আলখাল্লা ও ফকিরী আসবাব, এবং একতারা প্রভৃতি লইয়া লাফাইয়া নৃত্য করিত ও গাইত—"বাঁশের দোলাতে চড়ে—কেহে বটে শ্মশান-ঘাটে যাচ্ছ চলে।" সংসার লীলার অবসানে সেই বাঁশের দোলা অবলম্বন করিয়া প্রকৃতির সমস্ত দেনা চুকাইয়া—প্রত্যেককে ত শ্মশান-যাত্রী হইতে হইবে—সুতরাং প্রত্যেকের মনে এই সুর বৈরাগ্য জন্মাইত।

এই উপাসনার ভাবেই তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন সুয়াপুর গ্রাম বন্যা প্লাবিত,—কুত্রাপি চতুষ্পার্শ্বে একটু উঁচু স্থান নাই। কোথায় তাঁহাকে দাহ করা হইবে? ১৫ই ভাদ্র ১৮৮৬ সন, ঝরঝর করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমাদের একখানি বড় মেটে ঘরের প্রাচীরটা ঝুপ্ করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। মা বলিলেন "ঐ ঘরখানা গেল"—বাবা ক্ষীণ স্বরে বলিলেন, "এ কথা এখন আমায় শুনাইয়া লাভ কি?" কালীর মাতা (বিধবা ও আমাদের আত্মীয়া) আসিয়া বাবাকে বলিলেন "ঈশ্বর, কালী-দুর্গার নাম কর।" বাবা বিরক্তির সুরে বলিলেন "যাহা কখনও করি নাই, আপনারা শেষ মুহূর্ত্তে তাহা নিয়ে আমায় কষ্ট দিচ্ছেন কেন?" এই বলিয়া উপাসনার ভাবে চক্ষু বুজিলেন এবং আর দশ পনর মিনিটের মধ্যে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। বড় কয়েকখানি নৌকা একত্র করিয়া

তদুপরি স্তূপীকৃত মৃত্তিকায় শয্যা রচনাপূর্ব্বক চিতা নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে দাহ করা হইয়াছিল।

আমার মা এই ঘটনার কয়েক মাস পরে ৫ই ফাল্গুণে প্রাণ ত্যাগ করেন। পিতার মৃত্যুর পর যে তিনি শয্যাগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে শয্যা আর ত্যাগ করেন নাই। কেবল দেখিতাম সকালবেলা কাঁপিতে কাঁপিতে নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া আমার জন্য কিছু দুধ নিজে আনিয়া ক্ষীর করিবার জন্য কর্পূরা দিদিকে দিতেন এবং আমি যখন খাইতাম, তখন বিছানা হইতে আমার খাওয়া দেখিতেন। একবার ঝড়ে নৌকা ডুবিয়া বহু কষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া মা বাবার কোলে ফিরিয়া কাঁদিয়া তাহাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়াছিলাম; তখন মনে হইয়াছিল বিপদ কাটিয়া গেল—শান্তির স্থান পাইলাম। তারপর যে জীবনে কত দুঃখ কত ঝড় সহিলাম—হতাশ হইয়া কার কাছে যাইব—ব্যাকুল ভাবে খুঁজিয়াছি, তেমন নিরাপদ্ স্থান ত আর পাই নাই।

পিতামাতার মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্ব্বে আমার দুইটি ছোট ভগিনী মৃণ্ময়ী ও কাদম্বিনী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। দুইজনের মৃত্যুই আকস্মিক, কাদম্বিনী সন্ন্যাস রোগে প্রাণত্যাগ করে, তখন তাহার ১৪ বছর বয়স। এই ঘটনার একমাস পরে মৃণ্ময়ী প্রথম সন্তান হওয়ার পর ধনুষ্টঙ্কার রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তখন তাহার বয়স ১৬ বৎসর। মৃণ্ময়ীর সেই পদ্ম-পলাশনিভ চোখদুটী চিরদিনের জন্য মুদিত হইল! আমাদের বাড়ীর দক্ষিণদিকের পুকুরে যখন সে সাঁতার কাটিয়া জলক্রীড়া করিত তখন পূর্ব্বদিকের সূর্য্যালোকে সেই চোখ দুটীর উপর পড়িয়া—তাহা পদ্মের মতই দেখাইত। কাদম্বিনীর সেই স্নিগ্ধ শ্যামাভ বর্ণ ও নিবিড় দীর্ঘ কেশদাম—যাহা মৃত্তিকাস্পর্শ করিবার উচ্চাভিলাস পোষণ করিত—তাহা শ্মশানে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। ইংরেজী

১৮৮৬ সনে আমার পিতামাতা ভগিনী সকলকে হারাইলাম, এবং বাত-ব্যাধি রোগে দক্ষিণাঙ্গ হীনবল হইয়া আমি শয্যা গ্রহণ করিলাম। দুগ্রহের রোষবহ্নি তখন ধক্ ধক্ করিয়া আমার উপর জ্বলিতেছিল, তাহা ভাবিতে এখনও শরীর ভয়ে কাঁপিয়া উঠে।

---

(৮)

খেলাধূলা।

পড়াশুনার কথা পুনরায় সুরু করিবার পূর্ব্বে আমরা বাল্য ও কৈশোর জীবনে যে সকল খেলা খেলিয়াছি ও আমোদপ্রমোদ করিয়াছি তাহার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দিতে চেষ্টা করিব।

আমার বাল্য-লীলার কেন্দ্র ছিল তিনটী। একটী মাণিকগঞ্জে, যেখানে আমার পিতা ওকালতি করিতেন, দ্বিতীয় মাতুলালয় বগজুরী গ্রামে যেখানে আমার জন্মহয়, তৃতীয় সুয়াপুরগ্রামে—আমাদের বাড়ীতে।

মাণিকগঞ্জের খেলার সাথীদের কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, আমার নিত্যসহচর ছিল, প্রসন্ন গুহ।

বাজারের নিকট খোলা মাঠে আমরা ক্রিকেট খেলিতাম; কখনও বা "হাডু-ডু-ডু" খেলিতাম। "হাডু-ডু-ডু" খেলিবার তিন রকম মন্ত্র ছিল। একটা নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে "ডু-ডু" শব্দ করিতে করিতে রওনা হইতে হইত। এক নিশ্বাসে—"ডু-ডু" শব্দ করিতে করিতে যাহাকে ছোঁয়া যাইত, সেই "মরিত"; অর্থাৎ সে কিছুকালের জন্য অর্থাৎ সেই খেলোয়াড়ের আয়ু পর্য্যন্ত, খেলায় যোগ দান হইতে বঞ্চিত হইয়া থাকিত। খেলোয়াড় এইভাবে "ডু-ডু" শব্দ করিতে করিতে ইহাকে উহাকে ছুইতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাহার নিশ্বাসটা ফুরাইয়া গেলে যদি কেহ তাহাকে ধরিত, তবে সে "মরিয়া যাইত।" অনেক সময় দেখা গিয়াছে, সে এক নিশ্বাসের মধ্যেই একজনকে ছুঁইয়াছে,

কি ভাবে বিদ্রোহী হইয়া আমিনদিগকে আক্কেল দিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে একটা গান সে খুব তার স্বরে নিত্যই গাহিত, আমিও তাহার দোহারগিরি করিতাম, যেমন গায়ক তেমনই দোহার। উভয়ের কণ্ঠ হইতে যে স্বর-লহরী উত্থিত হইত তাহাকে "কাক-কোলাহল" ভিন্ন অন্য নাম দেওয়া যাইতে পারিত না। গানটার কিছু কিছু অংশ আমার এখনও মনে আছে। তাহা এই—

"শুন্‌ছ নি ভাই সবারা চাঁদ মিঞা
যে খই পাঠাইছে।
লাল বলদ লাগিয়ে দেবে
যেতর বাড়ী আমিন আছে।"

এই গানটি রচিত ছিল 'সন্ধ্যা-ভাষায়'। অর্থাৎ কতকগুলি শব্দ তাহারা নিজেদের মধ্যে পারিভাষিক করিয়া তোলয়াছিল। উদ্ধৃত দুটি ছত্রে 'খই' শব্দের অর্থ সংবাদ এবং লাল বলদ অর্থ আগুন। চাঁদ মিঞা ছিল দলের নেতা, তাহার আজ্ঞা ছিল যে যে বাড়ীতে আমিন আসিয়াছে, সেই সেই বাড়ীতে আগুন লাগাইয়া দিতে হইবে।

বাজারের কাছে কখনও কখনও খেম্‌টা নাচ হইত, প্রায়ই বারোয়ারী পূজা উপলক্ষে। সে নাচ অতীব জঘন্য। কিন্তু আমার তখন আট নয় বছর বয়স—তখন তাহার কিছু বুঝিতাম না। খেমটাওয়ালীর অতি দুষ্ট অঙ্গ ভঙ্গী দেখিয়া বহুলোক—তাহার মধ্যে ভদ্রলোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না—যে কিরূপ উন্মত্ত উত্তেজনা দেখাইত, তাহা মনে পড়িলে আমার এখনও লজ্জা হয়। সেই সমবেত দর্শকগণের

মধ্যে কেহ কেহ আবার অতি অশ্লীল মন্তব্য উচ্চ স্বরে প্রকাশ করিয়া স্ত্রীলোকটিকে উৎসাহ দিতে থাকিত,—তাহাতে নর্ত্তন-ভঙ্গীর ধৃষ্টতা আরও বাড়িয়া যাইত ও নর্ত্তকীর মুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিত।

আমার যখন আট নয় বছর বয়স তখন সেই আসরে এক বাঈজির গান শুনিয়াছিলাম, তাহার বয়স কুড়ি বাইশ বছর ছিল। তাহার বর্ণ ছিল কালো-অঁাধারে আকাশে নবনীরদ-মালার ন্যায়, কালো হইলেও বর্ণটি ছিল স্নিগ্ধ, মন-ভুলানো; তাহার মুখ ঘিরিয়া বক্রাস্ত কেশদাম দুলিয়া দুলিয়া যেন ভ্রমরের মত খেলা করিতেছিল এবং পশ্চাৎ ভাগে অতি নিবিড় ও ঘন মুক্ত চুলরাশি যেন জমাট অাঁধারের মত শোভা পাইতেছিল। —"নবজলধর রূপ বড় মনে লাগে, কত কেঁদে মরবি লো তুই শ্যাম-অনুরাগে। ভেবে ছিলি যাবে দিন তোর সোহাগে সোহাগে।" তারপর বুঝিয়াছিলাম সে কালেংড়া সুরে গানটি গাইতেছিল। তাহার কণ্ঠ এমনই মধুর ছিল এবং সে এমনই ভাবের আবেশে গানটি গাইয়াছিল যে আজ ৪৩ বৎসর পরেও তাহার মূর্ত্তিটি ও করুণ সুর আমার যেন প্রত্যক্ষবৎ মনে হইতেছে। "নবজলধরের" কথা সে গাইতেছিল —কিন্তু তাহার চেহারাটিও নবজলধরের মতই ছিল।

কখন কখন সেই আসরে যাত্রা গান হইত, তখনও যাত্রায় বক্তৃতার ভাগ বেশী হয় নাই—গানের ভাগ বেশী ছিল। সে সকল গান আমি ভাল বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু 'সং'গুলির কথা বেশ মনে আছে, তাহারাই সেই আসর জমকাইয়া তুলিত। সংগুলির কথা প্রায়ই নীতি-বিরুদ্ধ প্রেম লইয়া হইত। একটা ছোড়া একদিন রন্ধন-নিরতা একটি রমণীর উদ্দেশ্যে, রান্নাঘরের পার্শ্বে অন্ধকারে দাঁড়াইয়া গাহিতেছিল—"নিতি নিতি ফিরি আমি তোমার কানাচে।"—এর মধ্যে সেই রমণীর স্বামিজী এক লগুড়

লইয়া প্রেমিকটিকে তাড়া করিলেন। রমণীটির বোধহয় গানটি একবারে মন্দ লাগে নাই—কারণ সে একটু আক্ষেপের ভাবেই স্বামীর কাণ্ডটা দেখিতেছিল। সংগুলির ব্যাপার প্রায় এইরূপ দুর্নীত প্রেম লইয়াই হইত। আর একজন নিরাশ প্রণয়ীর গান আমার এখনও মনে আছে "মজে শিমূলের ফুলে আমার একূল ওকূল দুকূল গেল।" কখনও এক পাগলা বামুন হাতে তুড়ি দিতে দিতে আসিয়া আসর জমকাইয়া গাইত "যা কিছু পাই তাইতে খুসি গো যা কিছু পাই—তাইতে খুসি, * * যদি লোকে করে পীড়াপীড়ি তবে পাগল হয়ে অমনি হাসি।.........তখন সাজিমাটি নিয়ে কাপড় ঘসি গো।" সে নাচিয়া গাইয়া আসর মাৎ করিয়া দিত। বলা নিষ্প্রয়োজন—উদ্ধৃতাংশে গানের অশ্লীল ভাগ বাদ দিয়াছি। কিন্তু আমাদের সুয়াপুরে যাত্রা কিম্বা মঙ্গল-গানের সং এই অশ্লীলতা দুষ্ট হইত না,—সে সকল সং আসিত ছেলেদিগকে হাসাইতে। অনেক সময়ই তাহারা মূল কাহিনীর অঙ্গীয় হইত,—লবকুশের যুদ্ধের পালা একবার আমাদের বাড়ীতে হইয়াছিল—তাহাতে লবকুশের সঙ্গে বানরদিগের যুদ্ধ উপলক্ষ করিয়া এই ভাবে হাস্যরস অবতারিত হইয়াছিল—"দাদাগো" বলিয়া লব কুশকে এক একটা বানর দেখাইয়া তাহার রূপ বর্ণনা করিতেছিল—"দেখছ না—সে বেটাত ছিল ভাল, আর এক বেটা আসছে দাড়িতে বেঁধে পলো।" এই ভাবে এক একটা বানরের মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়া সে এমনই হাস্যরসের উদ্দীপনা করিয়াছিল যে আমরা শিশুমণ্ডলী আমোদেঃ চোট সামলাইতে না পারিয়া হাসিতে হাসিতে মাটীতে গড়াগড়ি যাইতেছিলাম।

আমার মামার বাড়ীতে বাহির খণ্ডে পূজার সময় যে কবি-গান হইত তাহা মেয়েদের দেখ্‌বার উপায় ছিল না। সে কবিগণের মত অশ্লীল কিছু মনে ধারণা করা যায় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র হইয়া যেরূপ

ভঙ্গীতে নাচ্‌তে থাক্‌তো,—তাহা পুরী ও কনারকের মন্দিরের বীভৎস মূর্ত্তিগুলির সঙ্গে তুলিত হইতে পারে—তফাৎ এই সেই পাথরের খোদাই মূর্ত্তিগুলি একবারে নগ্ন, আর কবির দলের পুরুষ ও স্ত্রী বস্ত্র ত্যাগ করিত না। কতকাল যাবৎ যে মন্দির-প্রাঙ্গন এই যৌন বীভৎসতাকে প্রশ্রয় দিয়াছে বলা যায় না, কিন্তু যদি প্রস্তর বা মৃণ্ময় দেবতারা কথা কহিতে পারিতেন, তবে নিশ্চয়ই এই সকল বিকট উৎসব থামাইয়া দিতেন। যাঁহারা কথা কহিতে পারে না তাহাদের যে কত বিড়ম্বনা ও উৎপাৎ সহ্য করিতে হয়—তা বলিয়া শেষ করা যায় না, দেবতারাও তাহা হইতে বাদ পড়েন না।

কিন্তু এই সকল ছাড়া কথকতা, কীর্ত্তন, চণ্ডীমঙ্গল, রামমঙ্গল প্রভৃতিতে প্রকৃত ভক্তির উচ্ছ্বাস আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি। সুয়াপুর গ্রামে বৎসর বৎসর এক অধিকারী ঠাকুর (তাঁহার নাম আমি ভুলিয়া গিয়াছি) রামমঙ্গল গান করিতেন, তাঁহার গান আমরা আগাগোড়া হাঁ করিয়া শুনিয়াছি। তিনি গানে গানে যেন ছবি আঁকিয়া যাইতেন। একটা চামর দোলাইয়া তিনি আসরের এদিক-ওদিক ঘুরিয়া গান করিতেন—একাই যেন একশ। তাঁহার সঙ্গের লোকেরা "দোহার" হইত। তিনি একাই রাম হইয়া বনবাস যাইবার প্রস্তাব করিতেন এবং সীতা হইয়া স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার জন্য অনুনয় করিতেন, কৌশল্যা হইয়া বিলাপ করিতেন এবং দশরথ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতেন। যখন সং দেওয়ার দরকার হইত, তখন "দোহার"দের মধ্য হইতে একটা লোককে ধরিয়া আনিয়া আসরে তাঁহার সাম্‌না সাম্‌নি দাঁড় করাইতেন এবং তাহার সহিত নানারূপ কৌতুকপূর্ণ বাদানুবাদ করিয়া আমাদিগকে হাসাইতেন।

কিন্তু এই সকল সাধারণ উৎসবে আমাদের আমোদের তৃষ্ণা

মিটিত না। আমরা কতরূপ যে দুষ্টামি করিতাম—তাহা ভাবিলে এখনকার বালকদিগকে নিতান্ত শান্ত-শিষ্ট বলিয়া মনে হয়। আমাদেরই বাড়ীতে আমার দলের বালকেরা ভাল আম কাঁটাল, খেজুর-রস, গোলাপ জাম প্রভৃতি চুরি করিত। এ সকল কাণ্ড দ্বিপ্রহর রাত্রে হইত। আমি থাকিতাম পাহারা, অর্থাৎ বাড়ীর কেহ জাগিলে, দলের ছেলেদিগকে সতর্ক করিয়া দিতাম। আমাদের বাড়ীতে খুব বড় একটা কড়াতে সর তৈরী করিবার জন্য দুধ জ্বাল দেওয়া হইত। উনুনের আঁচ কমাইয়া দিয়া তাহার উপর প্রকাণ্ড কড়াটা রাখিয়া দিবা দ্বিপ্রহরে মা ঘুমাইয়া পড়িতেন। ঝি চাকরেরা বাহিরে ঘুমাইত। এমন সময় আমরা দুই তিনজনে বাহির হইতে রান্নাঘরের বেড়ার ফাঁক দিয়া সুদীর্ঘ পাকাটি চালাইয়া উহা কড়াটার মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া সমস্ত দুধটা খাইয়া ফেলিতাম। শুধু সরটা কড়ার নীচে শুইয়া পড়িয়া থাকিত। এই সকল উপদ্রব শুধু কৌতুকের জন্যই বেশী করিতাম—ক্ষুধার তাড়নায় নহে। দ্বিপ্রহর রাত্রে নানা ফল ও খাদ্য দ্রব্য নিজেদের বাড়ী হইতে চুরি করিয়া আমরা পুকুরের ধারে বসিয়া সাবাড় করিতাম। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ মুড়ি দিয়া এক একখানি কাঁটাল খাইয়া ফেলিত। এই ভাবে উদর পূর্ণ এমন কি অত্যধিক স্ফীত করিয়া আমরা সেই রাত্রিকালে পুকুরের জলে ঝাপিয়া পড়িতাম। শেষ রাত্রে আস্তে বাড়ী ঢুকিয়া কাপড় ছাড়িয়া ঘুমাইয়া পড়িতাম। বগজুরী গ্রামে আমি ও আমার মামাত ভাই হীরালাল গামলায় চড়িয়া পুকুরের জলে বেড়াইতাম। একটা বৈঠা ঘুরাইয়া জল কাটিয়া আমরা অগ্রসর হইতাম। গামলাটা আমাদিগকে লইয়া চরকার মত ঘুরিতে ঘুরিতে চলিত। অবশ্য এক একটা গামলায় এক একজন মাত্র চড়িয়া এই জল-কেলী করিতে পারিত। আমি ধলে-

খরীর ন্যায় বড় নদীর উপর গামলার "বাছ" দেখিয়াছি। ২০।২৫ জন গামলায় চড়িয়া দ্রুতবেগে নদী পাড়ি দিয়াছে। যে ব্যক্তি সকলের পূর্ব্বে যাইতে পারিয়াছে, সে পুরস্কার পাইয়াছে।

আমি ও হীরালাল দোতলার উপর একটা ছোট ঘরে বসিয়া কত ছবি আঁকিতাম, তাহা আর কি বলিব। হরিতাল গুলিয়া হলুদ রং করিতাম, সিন্দুর গুলিয়া লাল করিতাম। প্রতিমা গড়িতে গোলক-দেউরী আসিত, তাহার কাছে অনেক চাহিয়া চিন্তিয়া কিছু কিছু রং আদায় করিতাম, তখন অল্প দামের রংয়ের বাক্স সর্ব্বত্র পাওয়া যাইত না। আমরা আঁকিতাম দশমুণ্ড কুড়ি হস্ত রাবণ-রাজা, ও লোল রসনা দিগ্বসনা কালী মূর্ত্তি,—কখনও কখনও রাম-সীতা, বাঘ ও বেড়াল আঁকিতাম। "নূতন পুকুরে"র পাড়ে বসিয়া মাটি ছানিয়া কত যে কালী-মূর্ত্তি ও সরস্বতী-মূর্ত্তি তৈরী করিয়াছি তাহার অবধি নাই! সেই মূর্ত্তি শুকাইলে তাহাতে রং চড়াইয়া তার পর পূজার ব্যবস্থা করিয়াছি। দুপুরের রৌদ্রে মাথার চাঁদি ফাটিয়া যাইতেছে, আমরা দুই ভাই বসিয়া নিপুনভাবে ঐ সকল মাটির মূর্ত্তি গড়িতেছি, এমন সময় আমার ছোট মাতুল শ্রীমোহন সেনের উচ্চ কণ্ঠ শুনিয়া পালাইয়া গিয়াছি। বস্তুত তাঁহার তাড়নায় একদণ্ড স্থির হইয়া আমরা ছবি আঁকিতে পারি নাই, মাটির মূর্ত্তি গড়িতে পারি নাই, "কাশীর" গাছে চড়িয়া কুল খাইতে পারি নাই। প্রায়ই এই সকল গুরুতর কার্য্য অর্দ্ধ-সমাপ্ত রাখিয়া আমা-দিগকে পলাইয়া যাইতে হইয়াছে। আজ আমার স্মৃতিতে ছোট মামার সেই স্নেহ-গঞ্জনার সুর মধু হইতেও মধুর বোধ হইতেছে। তাঁহাকে আর পাইব না, হীরালালও আমাদিগকে ছাড়িয়া গিয়াছে।

একদা আমি মানিকগঞ্জে কাগজে কাঁচি দিয়া কাটিয়া অনেকগুলি মূর্ত্তি তৈরী করিয়া ফেলিলাম। সমস্ত রাম-বনবাসের পালাটা এইভাবে



গ্রন্থকারের মাতুল স্বর্গীয় শ্রীমোহন সেন।

প্রস্তুত হইল। রাম গড়িলাম, দশরথ, সীতা, কৌশল্যা, কৈকেয়ী, ভরত প্রভৃতি সকলই তৈরী হইল। দিব্য একটা কুজ করিয়া মন্থরা প্রস্তুত করিলাম, এবং কাগজের সরু সরু স্তর কাটিয়া রামের জটা বানাইলাম। তারপর একটা বড় ঘরে খুব লম্বা একটা সুতা লট্‌কাইয়া তাহার উপর সেই কাগজে কাটা মূর্ত্তিগুলি ঝুলাইয়া পর পর সাজাইয়া রাখিলাম। সেই ঘরের দরজায় একটা লম্বা কাপড় টাঙ্গাইয়া সেই কাপড়খানি জলে আর্দ্র করিয়া অপর একটা দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিলাম, এবং একটা লণ্ঠন হাতে করিয়া সেই কাপড়ের মধ্যে প্রতিফলিত মূর্ত্তির ছায়া দিয়া ছায়াবাজি দেখাইতে লাগিলাম। লণ্ঠনটা কাছে আনিলে মূর্ত্তিগুলির ছায়া খুব বড় হইত এবং দূরে নিলে ছায়াগুলি খুব ছোট দেখাইত। এই উৎসব দেখাইবার জন্য বহু বালককে নিমন্ত্রণ করিলাম, তন্মধ্যে বগজুরী হইতে হীরালাল আসিল। আমার বয়স তখন ৯, হীরালালের বয়স ৭। ইহার বহু বৎসর পরে H. L. Sen and Bros (এচ, এল সেন এণ্ড ব্রস) নাম দিয়া হীরালাল কলিকাতা ফটোগ্রাফের কারবার খোলে এবং সর্ব্বপ্রথম সেই কলিকাতায় বায়স্কোপ আনাইয়া দেখায়। তাহার বায়স্কোপ কোম্পানির নাম "রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানি" এখন তাহার ভ্রাতা মতিলাল সেই কারবার চালাইতেছে। রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানিই কলিকাতার আদি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বায়স্কোপ কোম্পানি ছিল। হীরালালের মত ফটোগ্রাফ তুলিতে খুব অল্প ব্যক্তিই পারিতেন। সে নিজে ফিলিম আনাইয়া বায়স্কোপের দেশীয় কয়েকখানি ছবি উঠাইয়াছিল। তাহার কোম্পানির আয়ও বিস্তর হইয়াছিল। কিন্তু চরিত্রদোষে সে সমস্ত মাটী করিয়া ফেলিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। যতদূর মনে পড়ে হীরালালের ভাগিনেয় (আমার মামাত ভগিনীর ছেলে) ভোলা পার্শী ম্যাডানের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দিয়া নূতন বায়স্কোপ কোম্পানি

স্থাপনের প্রস্তাব করে। এইভাবে ভুবনবিজয়ী "এলফিনষ্টনে"র সূত্রপাত হয়। হীরালালের হাতে শিক্ষালাভ করিয়া ভোলাই ম্যাডান মহোদয়কে এই কার্য্যে লওয়ায়, এবং তাঁহার কোম্পানীর প্রাথমিক সফলতার কারণ হয়। হীরালালের প্রতিভা অনন্য-সাধারণ ছিল, সে ইংলণ্ড ও এমেরিকার ফটোগ্রাফ ও বায়স্কোপ-সাহিত্যের যেরূপ চর্চ্চা করিয়াছিল, সেইরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিরল। সে শুধু ফটোগ্রাফি শিখিবার জন্য ১৪।১৫০০০৲ টাকা খরচ করিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে তাহার যে ষ্টুডিও ছিল, তাহা এতদ্দেশে যে কোন শিল্পীর গৌরবের কারণ হইতে পারিত। তাহার চরিত্র তুষার-শুভ্র ছিল, কলিকাতার থিয়েটারের পাল্লায় পড়িয়া নটরাজ বন্ধুবর্গের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া সেই হীরালাল যেরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়াছিল—তাহা তদ্রূপ কুসংসর্গের পরিণামের একটা জলন্ত দৃষ্টান্ত।

হীরালাল একদিন আমাকে বলিয়াছিল "দাদা, বলত আমার যে চিত্র বিদ্যা, ফটোগ্রাফী ও বায়স্কোপের প্রতি এই একান্ত অনুরাগ ও ঝোঁক, তাহা কেমন করিয়া হইল?"

আমি বলিলাম,—"ঐইগুলি নিয়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাক্‌তে থাক্‌তে ঝোঁক হ'য়েছে। এন্ট্রেন্স পর্য্যন্ত পড়ে পড়া ছেড়ে দিলি, তার পর তো এই কচ্ছিস্—ঝোঁক এতে ক'রেই হয়েছে।"

সে বলিল "না দাদা—এই ঝোঁকের মূলে তুমি, তুমি যে আমাকে লইয়া ছবি আঁকিতে, সেই সময় ইহার সূত্রপাত, তুমি যে দিন আমাকে ছায়াবাজি দেখাইয়াছিলে সে দিন যে আমার মনে যুগ উল্টিয়া গিয়াছিল, তাহা তোমায় বলি নাই—কিন্তু সেই ছায়াবাজি দেখার কথা কৈশোর-জীবনে প্রতিদিন আমার মনে পড়িয়াছে—উহাই এই রয়েল বায়স্কোপের ভিত্তি।" কেউ নিজ ঘরে বসিয়া এক টুকরা কাগজে আগুনে ধরাইয়া

যেরূপ অবহেলায় তাহা ফু দিয়া উড়াইয়া দেয় এবং সেই জ্বলন্ত কাগজটা অপর একজনের ঘরের চালে পড়িয়া তাহা অগ্নিময় করিয়া ফেলে, এ হচ্ছে সেইরূপ। হীরালালের মানসিক শক্তি ও রুচি ছিল এই কলা-বিদ্যার দিকে, সুতরাং আমার কাছে যাহা ছেলে খেলা ছিল, তাহা তাহার প্রকৃতির প্রবর্ত্তক হইয়া দাঁড়াইল। হীরালালের প্রকৃতি কলা-বিদ্যার ক্ষেত্র ছিল—আমার খেলাধুলা যাইয়া সেখানে বেশ সোনার ফসল জন্মাইয়া ফেলিল—সে এ জন্য আমার যে গৌরব দিয়াছিল, তাহা আমার একবারেই প্রাপ্য নয়।

আমাদের আর একটা খেলা ছিল, পুকুরে বা নদীতে যাইয়া পরস্পরের মুখে জল ছুড়িয়া মারা। এই জল ছুড়িয়া মারা কার্য্যে আমার মত দক্ষ কেউ ছিল না। আমি দুর্ব্বল ছিলাম, কিন্তু জল ছুড়িয়া আমা অপেক্ষা বহু বলিষ্ঠ ব্যক্তিকে আমি অন্ধের মত করিয়া ফেলিয়াছি, সে হাতড়াইতে হাতড়াইতে পলাইয়া নিষ্কৃতির পথ খুঁজিয়াছে। অনেক সময় পাঁচ ছয় জন একত্র হইয়া আমার মুখে জল ছুড়িয়া মারিয়াছে, আমি সব্যসাচীর ন্যায় একা তাহাদিগের প্রত্যেকের প্রতি এরূপ ক্ষিপ্রভাবে জল প্রক্ষেপ করিয়াছি যে সপ্তরথীর মত তাহারা রণে ভঙ্গ দিয়াছে। আমার সঙ্গে কতক সময় যুঝিতে পারিত একমাত্র নলিনী। তাহাও ১০। ১৫ মিনিটের বেশী নয়। প্রাতে ৮টার সময় ধলেশ্বরীর শাখা গাজিখালি (কানাই নদীতে) এই ভাবে যাইয়া জলক্রীড়া করিতে সুরু করিয়াছি এবং বেলা তিনটার সময় চক্ষু দুটি রক্তজবার ন্যায় করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছি। কত দলকে যে এইভাবে ঘাল করিয়াছি, কত স্নানার্থীর দল যে এই সময়ের স্নান সমাধা করিয়া চলিয়া গিয়াছে, এবং আমি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কিরূপ অটুট বিক্রমে যুঝিয়াছি, তাহা আর কি লিখিব। আমার মাতা আমার এই সকল ব্যবহারে কিরূপ কষ্ট পাইতেন, তাহা বুঝান শক্ত। কতবার

লোক পাঠাইয়া হয়রাণ হইতেন, এবং শেষে ঘরে বসিয়া কাঁদিতে থাকিতেন। যখন তৃতীয় প্রহর বেলায় বাড়ী ফিরিতাম, তখন মা যেন আমায় হাটিয়া আসিতে দেখিয়াও আশ্চর্য্য হইতেন, এই অবস্থায় কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে, তাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ভগবান তাহার ফলে আমাকে এত অত্যাচারেও মারিয়া ফেলান নাই—এই জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। এইরূপে ডান হাতের উপর প্রচণ্ড অত্যাচার করাতে সমস্ত ডান দিকটা অবশ হইয়া আমি বাতব্যাধি রোগে পঙ্গু হইয়া পড়িয়াছিলাম। মাতা ইহারই আশঙ্কা করিয়া কত অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেন, হায় সেই মাতৃ অশ্রু! তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ আমার জীবনে যে কত কষ্ট পাইয়াছি—তাহা লিখিবার শক্তি আমার নাই।

পূর্ব্ববঙ্গ নদী মাতৃক দেশ। যখন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আসিলাম, তখন বারি-বিরল শুষ্ক নাগরীক দৃশ্য ও দুর্গন্ধ জঞ্জাল পূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডোবা আমার চক্ষু দুটিকে যেন পীড়িত করিয়াছিল। কোথায় সেই অপর্য্যাপ্ত বন্যায় জল সঞ্চার! কোথায় সেই পূর্ণ-তোয়া ধবল ফেনিল তরঙ্গ,—ফুল্লকুন্দ তুষার সদৃশ শুভ্র ধলেশ্বরীর শ্বেতাজ-সুন্দর বিরাটরূপ! কোথায় সেই উদ্দাম উত্তাল চক্রাকৃতি ঘূর্ণবায়ুসমুত্থিতঅট্টহাস্যময়ী মহামহিমান্বিতা পদ্মা! কোথায় সেই অতলস্পর্শ সাভারের নদী! একদিকে বংশাই, একদিকে কানাই, ব্যাঘ্রী যেরূপ শাবকদ্বয় লইয়া আস্ফালন করে—সেইরূপ উৎকট ক্রীড়াশীলতার রূপ—আমার পক্ষে যুগপৎ ভৈরব ও সুন্দর! বন্যার জলে যখন গ্রাম ভাসিয়া যাইত, মাতার ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সেই অনন্ত জলরাশির অঙ্কে ছোট ছোট অট্টালিকা ও পর্ণকুটীর কি সুন্দর দেখাইত! আমি আর অবিনাশ জ্যোৎস্নাধবলিত রাত্রে ছোট একখানি ডিঙ্গাতে শুইয়া থাকিতাম, নৌকা ভাসিয়া ভাসিয়া নান্নারের বিলের দিকে যাইত! উপরে

আকাশে তারা ও জোৎস্না এবং নিম্নে—হাট মাট ঘাট সমস্ত ডুবাইয়া বিশাল জলরাশিতে কত রক্তদল পদ্ম ও শুভ্রদল কুমুদ ফুটিয়া উঠিত। আমরা দুইজনে কতদিন ছবির ন্যায় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া সেই শোভা দেখিয়াছি। পূর্ব্ববঙ্গের বর্ষা যে না দেখিয়াছে, তাহার নিকট বরুণ দেবতা কি করিয়া পূজা পাইবেন? পদ্মার ক্রোড়ে যে ব্যক্তি জেলেদের মাছ ধরিতে না দেখিয়াছে—সে কি করিয়া বুঝিবে সে দেশের জেলেরা কেন আপনাদিগকে 'গঙ্গাপুত্র' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে?

এই জলে দুর্গোৎসবের সময় প্রতিমাবিসর্জ্জন লইয়া কত না আমোদ গিয়াছে? মনসাদেবীর ভাসান গান উপলক্ষে "নৌকা বাছ" লইয়া কত না উৎসব হইয়াছে! বন্ধুবর্গ সহ নৌকা বাহিয়া আমরা কত সুখে জ্যোৎস্না রাত্রি উপভোগ করিয়াছি। শিশুকালে আমরা একত্র মিলিয়া গাজিখালতে কোন দরিদ্রের নৌকা ছাড়িয়া দিয়া মধ্যে গাঙ্গে উহা ডুবাইয়া দিয়া সাঁতার কাটিয়া ফিরিয়া আসিয়াছি। পরদিন সেই দরিদ্রের আর্ত্তনাদে কর্ত্তাদের ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাঁহারা সেই দরিদ্রকে ২৫।৩০্ গুনাগারি দিয়া আমাদিগের প্রতি চক্ষু রাঙ্গাইয়া কত ভর্ৎসনা করিয়াছেন।

সেই সুয়াপুর গ্রামের স্মৃতি আমার নিকট কিরূপ মধুর, তাহা বলিবার ভাষা নাই। সে গ্রামের প্রত্যেক রমণীই যেন সেই শৈশবকালে আমাদের মাতা ছিলেন। যার বাড়ীতে রাত্রি হইয়াছে, তার বাড়ীতে শুইয়াছি। খাওয়ার সময় যে বাড়ীতে থাকিতাম, সেই বাড়ীতেই খাইয়াছি, বঙ্গপল্লীর সে আত্মপরবিরহিত ভ্রাতৃভাব এখন স্মৃতিতে পর্য্যবসিত। উহা দুঃস্বপ্নের মধ্যে একটুকু সুখ স্বপ্ন, ভাঙ্গা কৃষ্ণবর্ণ ভয়াবহ মেঘের আড়ালে এক খণ্ড ক্ষুদ্র চন্দ্রিকা।

আমরা সুয়াপুর শ্রীনাথ গুপ্তের বাহিরের ঘরে বসিয়া তাস খেলিতাম। আমার খেলার সাথী ছিল অবিনাশ, নলিনী, কুমুদিনী এবং মোহিনী (শেষোক্ত তিনজন সহোদর) সর্ব্বজ্যেষ্ঠ মোহিনী। আমাদের বাড়ী হইতে তাহাদের বাড়ী একটা পুকুরের এপার ওপার। বর্ষাকালে আমরা নৌকাতে পার হইতাম। ছোট নৌকা ঘাটে দিনরাত বাঁধাই থাকিত, একটা লগি দিয়া নৌকা বাহিয়া পার হইতাম। তাস খেলা তিন রকমের ছিল। ১। ডাকের খেলা, ২। দেখা বিস্তি ৩। বিস্তি বা গোরাবু। ডাকের খেলা তিনজনে, দেখা বিস্তি দুইজনে এবং গোরাবু চারজনে খেলিতে হইত। ডাকের খেলারই প্রচলন বেশী ছিল,—একবারে "রং"শূন্য হইলে খেলোয়াড় "বুরুজ" অর্থাৎ ফেল হইত। যে "বুরুজ" হইত সে সকল খেলোয়াড়দের হাতে নাকমলা-কানমলাটা খাইত। আমি আদুরে ছেলে—সুতরাং আমাকে ক্ষেপাইয়া, মারিয়া, ভেঙ্গচাইয়া অপরাপর বালকেরা একটা ক্রুর আমোদ অনুভব করিত। ডাকের খেলায় আমি "বুরুজ" হইলে একটা ছেঁড়া জুতার মালা আমার গলায় পরাইয়া দিয়া অপরাপর বালকেরা হাতে তালি দিয়া হাসিত এবং অন্দর হইতে মেয়েরা পর্য্যন্ত আমার সেই অবস্থা উকি মারিয়া দেখিয়া বেশ আমোদ অনুভব করিত, আমি কাঁদিতে কাঁদিতে নালিশ করিবার জন্য আমার সর্ব্বপ্রধান বিচারপতি মায়ের নিকট চলিয়া যাইতাম।

আমার যখন ১২ বছর বয়স, তখন আমাদের আত্মীয়দের এক বাড়ীতে তাঁহাদের নিকট সম্পর্কীয় একটি মহিলা তাঁহার শিশুদিগকে লইয়া আসিয়া কয়েক মাস বাস করিয়াছিলেন। আমার বর্ণ শ্যাম হইলেও ছেলেবেলায় আমার চেহারা লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। চুলগুলি ছিল আমার কোঁকড়ানো, এবং চোখ দুটি আমি বাবার কাছ থেকে পাইয়াছিলাম, তাহা ছিল বড় এবং ভীত শঙ্কিত দৃষ্টিপূর্ণ। সেই

মহিলার একটি মেয়ে ছিল—তার নাম ন—। তাহার তখন বয়স ১৩। সেই বাড়ীতে আমার একটি সহপাঠী ছিল, সে ছিল গৌরবর্ণ, সুশ্রী। ন—তাহাকে ছোট দাদা বলিয়া ডাকিত। ন—এর মূর্ত্তিটি আমার এখনও বেশ মনে আছে। চোখ দুটি হরিণের মত, গণ্ডে কে যেন চাঁপার রং, মল্লিকার শুভ্রবর্ণও যুথিজাতির স্নিগ্ধতা ঢালিয়া দিয়াছে, এলোমেলো চুলগুলি কখনও কপালের চারিদিকে ঝুলিয়া পড়িয়া সুন্দর দেখাইত, কখন বহু বেণীতে বদ্ধ থাকিয়া একটা কুণ্ডলাকৃতি ধুম্রের মত খোঁপা হইয়া যাইত, কখনও বা মেঘের একটি সূক্ষ্ম লহরের মত এক বেণী হইয়া পিঠে দুলিতে থাকিত। তাহাকে কখনই আমি হাঁটিতে দেখি নাই; নীলাম্বরী কাপড় খানির আঁচল দোলাইয়া সে প্রায়ই ছুটিয়া চলিত, এবং মাঝে মাঝে আমার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্যে অধর যুগল প্রসন্ন করিয়া পালাইয়া যাইত।

একদিন তাহাকে বাড়ীর বড় বড় মেয়েরা ধরিয়া পড়িল—"ন—তুই বল্, কাকে বে কর্‌বি?" সে লজ্জায় বিরক্তি-বোধক কতকগুলি গঞ্জনা করিয়া পালাইয়া গেল। কিন্তু সেই বাড়ীর একটি বউ তাহাকে কিছুতেই ছাড়িল না, সে নির্জ্জনে বহু মিনতি করিয়া অভয় দিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"বল্ ন—তুই কাকে বে কর্‌বি। আমি কারুকে বলব না" বহু সাধ্য সাধনায় এবং বারংবার প্রতিশ্রুতিতে নিশ্চিন্ত হইয়া সে বউটির কানের কাছে মুখ রাখিয়া প্রাণের কথাটা অতি মৃদুস্বরে বলিল "ঐ যে ছোট দাদার সঙ্গে বেড়ায়—নাম জানি না, ছোট দাদার মত ফর্সা নয়, কিন্তু দেখ্‌তে ভারি সুশ্রী।" নাম সে জানিত না, আমি বলিয়া দিতেছি—সেই দ্বাদশবর্ষীয় বালকের নাম দীনেশচন্দ্র।

এই কথা কৃতঘ্ন, অবিশ্বাসী বউটি সেই দিনই পাড়াময় রাষ্ট্র করিয়া দিল—তারপর কয়েকদিন আর পাড়ায় বাহির হইতে পারি নাই। যে

দেখিয়াছে সেই জিজ্ঞাসা করেছে "কিরে ন"...নাকি তোকে পছন্দ করিয়াছে ?" আমি লজ্জায় মরিয়া গেলাম। ন—ও তদবধি আমাকে দেখিলে ছুটিয়া পলাইত, কিন্তু চঞ্চল পাদক্ষেপে পলাইবার সময় হঠাৎ পাছ ফিরিয়া আমার দিকে তার সুন্দর চক্ষুর একটি দৃষ্টির ফুলবাণ নিক্ষেপ করিয়া যাইতে ভুলিত না।

তাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবার নয়, কারণ আমাদের গোত্র ছিল এক। সেই রমণীর অদৃষ্ট অতি মন্দ, বিবাহের ছয়মাস পরে সে বিধবা হয়, তাঁহার স্বামী সেই বৎসর বি, এ পরীক্ষা দেন। যদিও সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, কিন্তু গেজেটে ফল বাহির হইবার পূর্ব্বেই যক্ষ্মা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। তদবধি বিধবা, পূজা আহ্নিকও নানা ধর্ম্মানুষ্ঠানে দীর্ঘজীবন কাটাইয়া দিতেছেন। আমার সঙ্গে তার আর দেখা হয় নাই। কিন্তু গত বৎসর একজন আত্মীয়, যিনি "ন—এরও আত্মীয়, আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। তার নিকট শুনিলাম, তিনি আমার সম্বন্ধে অনেক কথা—এমন কি আমার চেহারা কিরূপ আছে—তাহাও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। শিশুকালের কথাগুলি আজীবন মনে থাকে, এটি কি আশ্চর্য্যের বিষয় নয় ? নতুবা সেই তাঁর ১০ বৎসর বয়সের দুদিনের দেখা—একটা ছেলেখেলা বই কিছুই নয়, তাঁহার স্মৃতি আজ ৫০ বৎসর বয়সে বা তাঁহার মনে থাকিবে কেন—এবং সেই কথা শুনে আমার মনেই বা কালিদাসের "মধুরানি নিশম্য শব্দান্" শ্লোকের ন্যায় পূর্ব্ব জন্মের স্মৃতি এরূপ অভাবনীয় মধুরালেখ্যের ন্যায় মনে পড়িবে কেন ?

কৈশোর কালের ন্যায় কাল মানুষের জীবনে আর নাই। শিশু অজ্ঞান, কিন্তু কিশোরের জ্ঞান হইয়াছে। যুবক প্রবল আকাঙ্ক্ষা লইয়া উন্মত্ত, তাহার স্বীয় মত, স্বীয় চরিত্র দৃঢ় হইয়াছে। কিন্তু এই শৈশব-

নিশার অজ্ঞাতালোক এবং যৌবন-দিবসের সম্যক প্রবুদ্ধালোকের সন্ধি-স্থলে যে কৈশোর-উষা তাহা বড়ই মনোরম। কিশোর পরের জন্য অনায়াসে জীবন দিতে পারে, প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে, প্রতিদানের কথা—হিসাবের কথা তাহার মনেই স্থান পায় না। এজন্য ভগবানের কিশোর-রূপ কল্পনা করিয়া শাস্ত্রকারের প্রেমধর্ম্ম বুঝাইয়াছেন।

পড়াশুনা

পাঠকের মনে থাকিতে পারে আমি ১৮৭৯ সনে মাইনর পাশ করিয়া কুমিল্লায় পড়িতে গিয়াছিলাম। সেখানে যাইয়া গভর্ণমেণ্ট স্কুলে চতুর্থ-শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলাম। তখন হেডমাষ্টার ছিলেন জগদ্বন্ধু ভদ্র,—ইনি সাহিত্য সমাজে সুপরিচিত। মেঘনাথ বধ কাব্যকে ঠাট্টা করিয়া "ছুছুন্দ-দরীবধ" নামক যে অপূর্ব্ব বিদ্রূপকাব্য রচিত হইয়াছিল, তাহার লেখক ছিলেন এই জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়। এই কাব্যটি পুরোপুরি রামগতি ন্যায় রত্ন মহাশয়ের বঙ্গ সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবে উদ্ধৃত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে তখন ইংরেজী ভাষায় ব্যুৎপন্ন ব্যক্তিদিগের শীর্ষ স্থানে ছিলেন ঢাকা জেলার মত্তগ্রামনিবাসী উমাচরণ দাস মহাশয়। তিনি যেমনই পণ্ডিত ছিলেন তেমনই সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উমাচরণ বাবুর সাহায্য লইয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদ প্রকাশ করেন। ইহাঁদের পূর্ব্বে কোন আধুনিক তন্ত্রের লোক এইসকল পদের প্রতি অনুরাগপ্রকাশ করেন নাই। তত্ত্বাবোধিনী পত্রিকায় "বংশী-ধরে"র প্রসঙ্গে সর্ব্বদা ঠাট্টা বিদ্রূপ প্রকাশিত হওয়ায় বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি শিক্ষিত সমাজের বরং একটা তীব্র ঘৃণার ভাবই ছিল। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় বহুসংখ্যক বাবাজির আখড়াতে ঘুরিয়া কি কষ্টে যে এই সকল পদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পদাবলীর ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইনিই এইক্ষেত্রে প্রথম হলধর, ইট-পাথর ভাঙ্গিয়া ইনিই এই ক্ষেত্র সর্ব্ব প্রথম হলচালনার উপযোগী করিয়াছিলেন। ইহাঁর পরে সারদামিত্র মহোদয়, কালীপ্রসন্ন কাব্য-বিশারদ, রমণীমল্লিক, অক্ষয়চন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীশ মজুমদার, নীলরতন, নগেন্দ্রগুপ্ত, সতীশ রায়, অমৃত-বাজার পত্রিকার অধ্যক্ষেরা—এবং অপর অপর শিক্ষিত লোক এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন—কিন্তু এই পথের সর্ব্বপ্রথম পথিক এবং নবতন্ত্রীদের মধ্যে এই বিষয়ের প্রথম দীক্ষিত ছিলেন ভদ্র মহাশয় ও উমাচরণবাবু।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের তৃতীয় কীর্ত্তি, তাঁহার অসাধারণ সংগ্রহ-নৈপুণ্য ও বিরাট অধ্যবসায়ের জীবন্ত দৃষ্টান্ত "গৌরপদতরঙ্গিণী"—সাহিত্য-পরিষৎ হইতে টাকির খ্যাতনামা জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম,এ বি এল্ মহাশয়ের ব্যয়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে—এখন ভদ্রমহাশয় স্বর্গগত; অপর কোন যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়া এই দুর্লভ পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় আসিয়াছে।

জগদ্বন্ধু ভদ্রমহাশয় ছিলেন হেডমাষ্টার। আমি চতুর্থশ্রেণীর পড়ুয়া, আমি তাঁহার কাছে পড়ি নাই। কিন্তু তিনি যে মাথার উপর চাপিয়া ছিলেন, এ বিষয়ে ত সন্দেহ নাই। তাঁহার চেহারাটা ছিল ছোটখাটো, রোগা ও শ্যামবর্ণ, তিনি অতি নিরীহ ব্যক্তি ছিলেন। যে যুগের শিক্ষকদের হস্তে বেত্র, চক্ষে রক্তিমা ও ভাষায় ভীতিপ্রদর্শন সর্ব্বদাই যেন ছাত্রের রক্ত শুষিয়া খাইত,—অধ্যাপনার সেই নিদারুণ যুগেও জগদ্বন্ধুবাবুর হাঁকডাক আমরা কখনও শুনি নাই। তিনি বৈষ্ণব সাহিত্য চর্চ্চা করিয়া প্রকৃতই বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন কবিগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সময় সময় ব্রজবুলিতে পদ-রচনা করিতেন, তাহা বিষ্ণু-প্রিয়া প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। ভদ্রমহাশয় বড়ই পানের ভক্ত ছিলেন,—তাম্বুলরসসিক্ত অধর-প্রান্ত তিনি রুমাল দিয়া মুছিতেন আর কথা কহিতেন। ইহার বহুদিন পরে তিনি ফরিদপুর জেলাস্কুলের

হেডমাষ্টার হইয়া আসিয়াছিলেন, তখন ইহার স্কুলে আর একটি ছাত্র ছিলেন, ছাত্রটি বোধ হয় তৃতীয় কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন—তিনি এখন বঙ্গদেশের নাতিক্ষুদ্র অংশ লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়া "অবতার" রূপে গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার নাম "প্রভুপাদ জগবন্ধু"। শুনিয়াছি সম্প্রতি তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছে, কেহ কেহ বিশ্বাস করেন, তাঁহার পুনরাবির্ভাব হইবে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে নিদারুণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হইয়া আমি একবৎসর ফরিদপুরে ছিলাম, তখন জগবন্ধুবাবু অবসর লইয়া তথায় বাস করিতেছিলেন। আমি শয্যাশায়ী, সুতরাং যাইতে পারিতাম না—তিনি প্রায়ই আমাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার মত অমায়িক ও সাহিত্য-প্রাণ, ভক্তিপরায়ণ লোক একালে খুব অল্পই দেখা যায়।

দ্বাদশবর্ষ বয়সে কুমিল্লায় যাইয়া পড়িতে লাগিলাম। তখন ক্লাসে যে সকল ছাত্র ছিল—তাহাদের মধ্যে একমাত্র ব্রজমোহনের অস্তিত্ব অবগত আছি। সে কুমিল্লার কোন মাইনর কি ছাত্রবৃত্তি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেছে। ক্লাসে আমার মত অল্পবয়স্ক ছাত্র কেহ ছিল না।

আমার আত্মীয় মুকুন্দ ও আমি এক বাসায় থাকিতাম। আমি উভচর জীবের ন্যায় চন্দ্রমোহন দাস মহাশয় ও আমার শ্বশুর—উভয়ের বাড়ীতেই থাকিতাম। রাত্রি-যাপন হইত শ্বশুর বাড়ীতে-মুকুন্দের সহিত এক শয্যায়। আমাদের খট্টার পার্শ্বে মাদুর পাতিয়া শুইত মহিমচাকর। সে আধবয়সী ছিল, জাতিতে ভূঁইমালী। সে আমাদিগকে পতিতা রমণীদের সম্বন্ধে তাহার বিগত যৌবনের কত কেচ্ছা যে শুনাইত, তাহার সংখ্যা নাই। সেই তরুণ বয়সে ঐ সকল গল্প শুনিতে আমাদের খুব ভাল লাগিত, আরব্য-উপন্যাসের গল্পের ন্যায়

সেগুলি কল্পনাকে মুগ্ধ করিত। শেষে সে প্রস্তাব করিল—আমাদিগকে গণিকা-বাড়ী লইয়া যাইতে। মুকুন্দ সেই সুদিনের প্রতীক্ষায় ছটফট্ করিতে লাগিল। আমার লোভও কম হয় নাই। আমি দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক ছিলাম, এবং মুকুন্দ ছিল চতুর্দ্দশবর্ষবয়স্ক। ইহার মধ্যে একদিন ঢাকা হইতে একপত্র পাইয়া জানিতে পারিলাম যে আমার সহাধ্যায়ী—প্রসন্ন গুহ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছে। ইহা শুনিয়া আমি একবারে ক্ষেপিয়া গেলাম, "তাহারা আমার এক বৎসর পূর্ব্বে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ হইবে—ইহা হইতেই পারে না। এখানে আমাকে কেউ তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোসন দেবেন না, কারণ আমি ভাল ছেলে নই। এখান হইতে ঢাকায় গেলে মাইনর পাশের সার্টিফিকেট দেখাইলেই আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইতে পারিব।" তখন এক স্কুল হইতে অন্য স্কুলে যাইতে কোনরূপই আঁটাআঁটি কিছু ছিল না। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া বাবাকে লিখিলাম—"আমাকে যদি কুমিল্লা হইতে লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত এখনই না করেন, তবে আমি পলাইয়া যাইব।"

এই বয়ঃসন্ধির সঙ্কটে—ভগবান্ আমাকে রক্ষা করিলেন। মুকুন্দ দত্ত নানা কারণে অল্পবয়সেই লেখাপড়া অবসান করিয়া জীবনটা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিল, আমি তাহার কাছে থাকিলে তো আমারও সেই গতি হইত! আমাদের শৈশবের জীবনের প্রাক্কালে তো সেই হতভাগ্য মহিম-মালী লালসার সল্‌তে জ্বালাইয়া আলেয়ার আলোর দিকে আমা-দিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল, একজনকে সে প্রতারিত করিয়াছিল—আমিও তো সেই পথে যাইতাম। কিন্তু হঠাৎ ঢাকায় যাইবার জেদ আমার মনে কে দিল? বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট পথ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া—তিনি এইভাবে অপরিহার্য্য কর্ম্মসূত্রের নিয়মে

সকলকে স্বতন্ত্র এক পথে সরাইয়া—টানিয়া লইয়া যান,—ইহাকেই "দৈব" বলে—ইহা পুরুষকারকে সর্ব্বদা পদদলিত করিয়া নিজের জয়ডঙ্কা বাজাইয়া জীব-জগতের ভবিষ্যৎ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেয়।

যথাসময়ে আমার শৈশবের নিত্য সহচর, যাহার ঘাড়ে পিঠে ক্রোড়ে আমি সর্ব্বদা বিহার করিতাম, যাহার চুল ছিঁড়িতাম, শরীরে কামড় দিয়া রক্ত বাহির করিয়া দিতাম, এবং যাহার ক্রুদ্ধ হস্তের মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আকৃষ্ট হইতে হইতে কত রৌদ্রের পথ হইতে ছায়ার পথে, কত বৃষ্টি-ধারা হইতে গৃহের ছাদের নীচে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আনীত হইতাম, সেই দ্বারকা সিংহ, আমাদের বাড়ীর চির বিশ্বস্ত শৈশবের চির-পরিচর আসিয়া উপস্থিত হইল। শ্বশুর-শাশুড়ীর চরণবন্দনা করিয়া, ঠাকুরদাদা চন্দ্রমোহন দাসের অনুমতি লইয়া আমি ইংরাজী ১৮৭৯ সনের পৌষ মাসে ঢাকায় পুনরায় ফিরিয়া চলিলাম। তখন আমি গোঁড়া হিন্দু। পথে নারায়ণগঞ্জে এক ভদ্রলোক উকিল আমার বাবার ছাত্র ছিলেন। বাবা তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন—"আমার ছেলে দীনেশ আমাদের একটি লোক লইয়া রাত্রে যদি নারায়ণগঞ্জে উপস্থিত হয়, তবে তুমি তাহার তত্ত্বাবধান করিয়া বাসায় রাখিও।" আমরা পিতার নির্দ্দেশ মত সেই বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সন্ধ্যাকাল, বাবুটি আমাদিগকে খুব যত্ন করিলেন; অল্প সময়ের মধ্যে নানারূপ পরিপাটী রান্না হইল। আমরা খাইতে বসিয়া গেলাম। কিন্তু আমার মনে একটা খট্‌কা বাঁধিয়া গেল। দেখিলাম একজন স্ত্রীলোক রান্না করিতেছে, তাহার আকৃতি ও ব্যবহার দেখিয়া তাহাকে ব্রাহ্মণী বলিয়া বোধ হইল না। এই স্ত্রীলোকটি আমাদের সকলের ভাত দিয়া গেল। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম সেই বাড়ীর চাকরটা "হেঁসেলে ঢুকিয়া খানিকটা নুন আনিল, তখন স্ত্রীলোকটি ব্যঞ্জন বাটিতে ঢালিতেছিল,—

ভৃত্য তাহাকে ছুঁইয়া নুন আনিল, তাহাতে স্ত্রীলোকটি কিছু বলিল না। তখন আমি নিশ্চিত বুঝিলাম, মেয়েলোকটি কখনই ব্রাহ্মণী নয় —নিশ্চয়ই শূদ্র-জাতীয়া। রাগে আমার শরীর কাঁপিতে লাগিল ও দুঃখে আমার চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল। এই সময়ে সেই ভদ্রলোকটির একজন আত্মীয় আমাদের পাতে ঘি দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি বলিলেন "দীনেশের পাতে বেশী করিয়া দাও।" আমার পাতে ঐ ব্যক্তি ঘি ঢালিতে লাগিলেন,—তিনি প্রায় আধ পোয়াটেক ঘি আমার পাতে ঢালিলেন, আমি হাঁ-না কিছুই বলিলাম না। ইহাতে সকলের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট হইল। ভদ্রলোকটি দেখিলেন, আমার চক্ষু হইতে অশ্রু গড়াইয়া গণ্ডে পড়িতেছে। ইহাতে তিনি যারপর নাই অপ্রস্তত হইলেন। একজন আগন্তুক ভদ্রলোক আসিয়া বলিলেন—"গাধা, আমি তোকে আগেই বলেছিলেম, ছেলেমানুষ হলেও তোর মত জাত-খেকো-তো সকলে নয়, তুই একদিন লজ্জা পাবি। দেখ্‌ছিস্ না বাঁশের থেকে কঞ্চি দড়।" যাহাহউক ভদ্রলোকটি, আমি বালক হইলেও, জোড়হাতে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আমাকে তুলিয়া লইয়া গেলেন। ইতিমধ্যে নিকটবর্ত্তী ব্রাহ্মণ পাড়ায় এ খবর পৌছিয়াছিল। তাঁদের একজন বহু সমাদরে আমাকে তাঁহাদের বাড়ীতে নিয়া খাওয়াইলেন। বলা বাহুল্য যে, বাবার ছাত্র ভদ্রলোকটি চোরের ন্যায় আমার পাছে পাছে অপরাধ-অনুতপ্ত-দৃষ্টি মৃত্তিকায় ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন, এবং আমার খাওয়া শেষ হইলে নিজে শেষে আসিয়া ভোজনে বসিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "যে কারণেই হউক, আমি এখানে আসাতে আপনাদের মিছামিছি কতকগুলি মনঃক্ষোভ ও কষ্ট হইল, এজন্য লজ্জিত আছি। তিনি কোন উত্তর দিলেন না, কিন্তু একথায় যে তাঁহার লজ্জা আরও বাড়িয়া গেল—তাহা বুঝিতে পারিলাম।

জীবনে আর একদিন হিন্দুত্বের গোঁড়ামি দেখাইয়াছিলাম। আমার মা গোঁড়া হিন্দু হইলেও তাঁহার মনে সেইদিন আঘাত দিয়াছিলাম। আমি তাঁহার সঙ্গে ঢাকা হইতে সুয়াপুর চলিয়াছি, তখন আমার বয়স একাদশ বর্ষ, সে ১৮৭৮খৃঃঅব্দে হইবে। মা আমার জন্য রান্না করিয়াছেন—ধলেশ্বরী দিয়া চলিয়াছি—বিস্তৃত নদীর অপর পাড় দেখা যাইতেছে না, একপাড়ের সিকতারাশি রোদে চিক্ চিক্ করিতেছে—সেখানে বহুদূর পর্য্যন্ত লোকালয়ের চিহ্ন, কদলী কিংবা অন্য কোন বৃক্ষের লেশ নাই। মা জেলে-ডিঙ্গি হইতে সদ্য-ধৃত ইলিস মৎস্য কিনিয়াছেন, তাহারই ঝোল ও ভাজা রান্না হইয়াছে। আমি মায়ের সাথে বসিয়া খাইব—এই আশায় বসিয়াছিলাম। মা বলিলেন "খোকা তুই খা।" আমি বলিলাম "আমি তোমার সাথে খাইব।" উত্তরে তিনি জানাইলেন, তিনি নৌকায় কিছু খাইবেন না।

আমি—"কেন"?

মা—"কি করিয়া খাই বল্, দুটো মেটে হাঁড়িতে রান্না হয়েছে, তার একটা কেটে গিয়েছে। নমঃশূদ্রদের নৌকা, তাদের কাঁসার থালা ভাল করে ধুয়ে দিয়াছে—তাতে গঙ্গাজল দিয়ে আবার ধুয়ে তোকে পরিবেশন করিয়া দিতেছি। কলিতে ধাতু-নির্ম্মিত পাত্রে দোষ নাই, তুই খা।"

আমি বলিলাম "তুমি খাবে না কেন, তা বুঝিলাম না।"

মা—"আমি বুড়ো হয়েছি, আমি ওদের থালায় কি ক'রে খাব?"

আমি—"না, তুমি না খেলে আমি খাব না।" মা অত্যন্ত দুঃখ ও বিরক্তির সঙ্গে বলিলেন, "স্থাখ্ খোকা, তুই মিছে কষ্ট আমায় দিস্ না, ঝোড়ো হাওয়ায় উনুনের আগুন কতবার নিবে গেছে—নাকের জলে—চোখের জলে এই রান্না হয়েছে! এত কষ্টের রান্না,—তুই ছেলে মানুষ, এতটা বাড়াবাড়ি কেন কচ্ছিস্।"

কিন্তু আমি সেই থালায় কিছুতেই খাইলাম না। মাঝিদের পাতা কাটিয়া আনিতে বলা হইল,তারা বলিল,"মা-ঠাকরুণ—এখুনি ঝড় আসিবে এখনই যদি পাড়ি না দিতে পারি, তবে বৈকালে বিপদের আশঙ্কা আছে, এখন কলাপাতের খোঁজ করিতে গেলে দুই তিন দণ্ড দেরি হইবে। আমাদের কি? আপনার এক ছেলে তাকে যদি এই বিপদে ফেল্‌তে চান, তবে আমাদের প্রাণের মমতা আর কি? আমরাত আপনাদের প্রজা, মর্‌তে বলেন, মর্‌তে পারি।"

মা ভয় পাইয়া কলাপাতা আনিতে লোক পাঠাইলেন না, এবং বহুক্ষণ ধরিয়া নীরবে চক্ষের জল মুছিতে লাগিলেন। শেষে রাত্রি কতকটা হইলে যখন দেখিলেন আমি কিছুতেই খাইলাম না, তখন ক্রোধের সহিত মাঝিদিগকে সেই সকল ভাত মাছ দিয়া বলিলেন "খোকা, বাড়াবাড়ি ভাল নয়, তুই যদি মোছলমানের ভাত না খাস্, তবে আমি বাপের বেটি নই, তোর অদৃষ্টে সকল অখাদ্যই একদিন খেতে হবে, এইটি মনে রাখিস্।" সে সকল আমার অদৃষ্টে হইয়াছে কিনা বলিতে চাই না, যদি ঘটিয়াই থাকে তবে তাহা মাতৃ অভিশাপের ফলে—আমার কোন হাত নাই। ব্রহ্মা বিষ্ণু যাহা পারেন নাই, দুর্লংঘ্য কর্ম্মফল ঠেকাইব, এমন সাধ্য আমার কি থাকিতে পারে?

মায়ের মনে যে আমি কতরূপে কত আঘাত দিয়াছি, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারিব না। মা বাঙ্গালা বই বেশ পড়্‌তে পারিতেন, কিন্তু তিনি লিখিতে পারিতেন না। একখানি চিঠি লিখাইবার জন্য যে তিনি আমাকে কত অনুনয় করিতেন, তাহা ভাবিতে আমার চোখের জল আইসে। "আমি এখন পার্‌ব না" এইরূপ হঠকারী ভাবে উত্তর দিয়া জেদ বজায় রাখিতাম। মা সমস্ত পাড়া ঘুরিয়া আসিতেন—হয়ত সে সময় কাহাকেও পাইলেন না, যে যার কাজে বাহির হইয়া গেছে।

দিদি হয়ত তীর্থদর্শনে বৃন্দাবন অঞ্চলে গিয়াছেন। এক ঘণ্টা পাড়া ঘুরিয়া কাগজ খানি হাতে করিয়া আমার খট্টার পার্শ্বে আসিয়া বসিতেন। ইচ্ছা যে তাঁহার পুত্র অনুতপ্ত হইয়া বলিবে—"মা, কেন কষ্ট কচ্ছ? আমি লিখে দিচ্ছি।" কিন্তু আমার মত হতভাগ্য এমন কেউ আছে? আমি মায়ের এই সামান্য কষ্ট টুকু দূর করিতে চেষ্টা করি নাই। কখনও কখনও বড় দুঃখে তাঁহার মুখ হইতে রূঢ় কথা বাহির হইয়াছে "এতটা গর্ব্ব ঠিক নয়! খোকা, যিনি হাতের শক্তি দিয়েছেন, তিনি সে শক্তি ফিরিয়া নিতে পারেন।" একটি ক্ষুদ্র দীর্ঘ নিশ্বাসের সঙ্গে উচ্চারিত এই সামান্য দুটি কথা যে আমার পক্ষে বজ্রাঘাতের ন্যায় হইয়াছে তাহা যদি মা জানিতেন, তবে এই কথাগুলি তিনি কিছুতেই বলিতেন না। জীবনের প্রায় ছয়টি বছর আমি অশক্ত দক্ষিণ হস্তে একটি পংক্তি লিখিতে পারি নাই। একখানি পত্র লিখাইতে হইলে পথের থেকে মানুষ ধরিয়া আনিতে হইয়াছে. তখন কিরণ ও অরুণ অতি-শিশু। মৃত্যুর সময় নিদারুণ হাঁফানি রোগে তিনি একদিন বড় কষ্টে বলিয়াছিলেন,—বোধহয় 'কুষ্মাণ্ড-খণ্ড" খেলে একটু আরাম বোধ করিতাম।" তখন আমি বি, এ পড়ি। আমার ধনশালী মামারা মায়ের কোন খোঁজ তখন নেন নাই। এইআক্ষেপ মনে হইতেছে আমি কুলি হইয়া মজুর হইয়া কেন কুষ্মাণ্ডখণ্ড কিনিয়া দিলাম না? ঢাকায় বড় বড় এক রকমের গোল বেগুন বাজারে পাওয়া যায়,তাহা বড় সুস্বাদু, তাহাকে "লাফা বেগুন" বলে; আমার বাবা তাহা খাইতে ভালবাসিতেন। আমি যতবার ঢাকায় গিয়াছি ও আসিয়াছি, তিনি প্রতিবারই বলিয়া দিতেন "দীনেশ, যদি পার, তবে কয়েকটা লাফা-বেগুণ আমার জন্য আনিও" সেই দুইচার পয়সার জিনিষও আনিতে আমি প্রতিবারই ভুলিয়া গিয়াছি। আমি বাড়ী গেলে তাঁহার বড় ইচ্ছা হইত, আমি খানিকক্ষণ তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকি; কিন্তু আমি এক

মুহূর্ত্ত বসিয়া চলিয়া যাইতাম। তিনি অতিশয় সংযমী ছিলেন; আমার ব্যবহারে কষ্ট পাইলেও মুখে কোন দিন কিছু বলেন নাই। জীবনে যে সকল কষ্ট পাইয়াছি ও পাইতেছি—তাহা যদি আমার যোগ্য না হয়, আর কার যোগ্য? তাঁহাদের স্নেহের কথা কি বলিব? সে অনন্ত স্নেহ কি করিয়া বুঝাইব! সমুদ্রের পর পার কে দেখাইবে? পদ্মার জল মাপিয়া তাহা কতখানি, কে বুঝাইবে? সে সকল কথা না বলাই ভাল। আমার অশ্রুর ঘন প্রাচীরে আমার অনুতাপ ও দুঃখ চিরকাল আবৃত হইয়া থাকুক, আমার মনের ব্যথা যেন ভাষায় ব্যক্ত না হয়! সে পবিত্র-ব্যথার প্রবাহে আমার সমস্ত পাপ ধুইয়া যাউক—বাহিরে তা বলিয়া হা হুতাশ করিলে আমার তপস্যা নষ্ট হইয়া যায়। এখন দেবতা দর্শনের জন্য কেন লোকে পুরী যায়, কেন মুমূর্ষু-ব্যক্তি সর্ব্বস্ব পণ করিয়া তীর্থের দিকে ছোটে তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারি। মনে হয় যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য মাতাপিতার চরণপদ্ম আবার দেখিতে পাইতাম, তবে আমার চক্ষু ধন্য হইয়া যাইত। কোন কথা বলিয়া সেই মুহূর্ত্তের সাক্ষাৎকারকে অযথা বাচালতার দ্বারা বিড়ম্বিত করিতাম না—কেবল তাঁহাদের শ্রীচরণ-প্রান্তে বসিয়া শ্রীমুখদ্বয়ের শোভা দেখিতাম, হরগৌরীর রূপ দেখিতাম, এবং অজস্র চক্ষুজলে যা বলিবার—তা সকলই বলিতাম, যতদুঃখ সহিয়াছি—তাঁহারা ছাড়িয়া যাওয়ার পর—সেই স্নেহের সহস্রাংশের একাংশও যে কোথাও পাই নাই, তাহা অশ্রু বিন্দুর দ্বারা নিবেদন করিতাম এবং যাহা কাচের ন্যায় অবহেলা দ্বারা উপেক্ষা করিয়াছি তাহা যে এখন আমার কাছে কৌস্তভ-কহিনূর হইতে কত বেশী মহার্ঘ হইয়াছে—তাহা বুঝাইতাম। ইহার নাম "দর্শনানন্দ"—এই দর্শন কি আর কোন জন্মে আমার ভাগ্যে ঘটিবে?

ঢাকায় আসিয়া কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। তখন কলেজিয়েট স্কুল নাম-ডাকের—অনেক ভাল ছেলে আমাদের সাথে পড়িত। সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছিল ললিত, তার চেহারাটি বেশ সুশ্রী ছিল, বুদ্ধি ছিল ক্ষুরধার। সে যে ইউনিভারসিটিতে প্রথম হইবে—ইহা সকলেরই বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া তাহার চরিত্রে দোষ ঘটে—সে এণ্ট্রেন্স পরীক্ষা পাশ হইয়া মাত্র দশ টাকার একটা বৃত্তি পাইয়াছিল। আমাদের সঙ্গে বিপিন চক্রবর্ত্তী পড়িত, এরূপ ভাল ছেলে বড় দেখা যায় না। কৈলাসবাবু হেডমাষ্টারের বাড়ীতে বহু লোকের রান্না করিয়া সে তাহার উদর-সংস্থান করিত ও বিধবা মাতার খরচ চালাইত। তাহার চেহারাটি ছিল প্রকৃতই ব্রাহ্মণের মত—প্রশান্ত, ধীর, কামনা-বর্জ্জিত, গৌরবর্ণ। সে এন্‌ট্রেন্স পরীক্ষায় পঞ্চম হইয়া কুড়ি টাকা বৃত্তি পায়। আমি বি, এ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে একত্র পড়িয়াছি, তাহার পিঠে কত কিল চড় মারিয়াছি, কিন্তু সে কথাটি বলে নাই। সে যখন নিবিষ্ট হইয়া অঙ্ক কষিতে থাকিত, তখন তাহার বাহ্য জ্ঞান থাকিত বলিয়া মনে হইত না। বি, এ খুব ভালভাবে পাশ করিয়া সে রুরকীতে যাইয়া ইঞ্জিনিয়ারী পড়ে, তথায় সে এত বেশী নম্বর পাইয়া প্রথম হইয়াছিল যে রুরকীর ইতিহাসে এরূপ নম্বর আর কেহ পান নাই। কাশীতে সে একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হইয়া 'রায়বাহাদুর' উপাধি পায়—তথায় সে সর্ব্বজন প্রিয় ছিল। আমার ভগিনী বিশ্বমনী দেবী তখন কাশীতে ছিলেন, কোন প্রয়োজনে আমি বিপিনকে লিখিয়াছিলাম দিদির সঙ্গে দেখা করিতে। সে এমনই অনাড়ম্বর ও নিরীহ ভাল মানুষ ছিল, যে দিদি তাহাকে পোনের কুড়ি টাকা মাহিয়ানার কেরাণী বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন। বিপিন অকালে প্রাণ ত্যাগ করে। কলেজিয়েট স্কুলে কয়েক দিনের জন্য অন্নদা-চরণের সঙ্গে পড়িয়াছিলাম, তিনি এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় হন এবং কুড়ি টাকা বৃত্তি উপার্জ্জন

করেন। তিনি ত্রিপুরা মহারাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন এবং অনেক দিন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করিয়াছিলেন—তাঁহার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইবার আমার কোন কালেই সুবিধা হয় নাই। আমার আর এক সহধ্যায়ী মনোমোহন। সে ময়মনসিংহের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয়ের ষ্টেটে সর্ব্বে-সর্ব্বা হইয়া ন্যাসনাল কলেজ স্থাপনের কল্পনায় ব্যস্ত ছিল,—তাহার বিশ্বাস, বিধাতা বিশ্বের সমস্ত বুদ্ধি তাহার মাথায় দিয়াছেন—একদিন সে আমায় বলিয়াছিল—"আমরা ছিলাম ক্লাসে ভাল ছেলে, তুই সকলের পাছে পড়িয়া থাকতিস্, কি আশ্চর্য্য তুই নাম ও খ্যাতি লাভ করলি, আমরা ভাল হয়ে সেরূপ পারলুম কৈ ?" দীনবন্ধু মজুমদার আমার আর এক সহাধ্যায়ী—ইহার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণী হইতে বি, এ পর্য্যন্ত পড়িয়াছি। কালো চেহারা মস্ত মস্ত দুটি চোখ, কথাবার্ত্তা মেয়েলী ঢংয়ের। এক জোড়া ছেঁড়া চটী পায় দিয়া সে এল এ, বি এ ক্লাসে চিরকাল যাতায়াত করিয়াছে এবং পদ্য লিখিয়া আমার সঙ্গে পত্র-ব্যবহার করিয়াছে, সেও এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়াছিল। এখন সে ইম্পিরিয়াল সেমিনারির হেড মাষ্টার - আমার প্রবর্ত্তনায় সে এবার বাঙ্গলায় এম এ, দিতেছে। কলেজিয়েট স্কুলে আমার বেশী দিন পড়া হইল না। কারণ আমার পিতার আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার এক ছাত্র ধামরাই নিবাসী অনাথবন্ধু মল্লিক জগন্নাথ স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ ছিলেন, তাঁহার সাহায্যে একটি ফ্রি ষ্টুডেণ্ট সিপ পাইয়া আমি জগন্নাথ স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তি হইলাম।

তখন মাতুলালয়ে থাকিতাম, আমার মাতামহের নামে তখন আমাদের সম্মানের অবধি ছিল না, স্বয়ং গণিমিঞা আমাদিগকে তাহার বাড়ীর উৎসব উপলক্ষে আদর ও স্নেহ দেখাইতেন।

জগন্নাথ স্কুলে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল কুমদিনী বসু। তাহার

চেহারাটি মেয়েলী ধরণের ছিল, রংটা খুব গৌরবর্ণ ছিল না, কিন্তু বড় স্নিগ্ধ ও লাবণ্যময় ছিল। আমাকেও লোকে মেয়েলী চেহারার ছেলে বলিয়া ঠাট্টা করিত। কুমুদিনী ও আমি ছিলাম সকলের থেকে বয়সে ছোট ও আমাদের পরস্পরের মধ্যে খুব ভাব ছিল; আমি এগারটি বোনের মধ্যে এক ছেলে, তাও আবার যমজ এক ভগিনীর সঙ্গে—সুতরাং আমার মুখে কতকটা মেয়েলী ভাব থাকা আশ্চর্য্য নহে। কুমুদিনী আমার চাইতে চার ছয় মাসের বড় ছিল। আমি ও সে—এই দুই জন বহু ছাত্রের লক্ষ্য ছিলাম, তাহারা যে আমাদের কাছে কি চাইত তাহা ভাল বুঝিতাম না। কিন্তু তাহারা লম্বা লম্বা চিঠি লিখিয়া জ্বালাতন করিত, কাছে আসিয়া ঘেঁসিয়া বসিবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত ও মুখের দিকে নির্ব্বাক হইয়া তাকাইয়া দেখিত। দুএকজন আবার নির্জ্জনে পাইলে এরূপ সকল কথা বলিত যেন দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে কিম্বা আয়েষা জগৎসিংহকে বলিতেছে। এই উৎপাতে কুমুদিনী ও আমি বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতাম। ইহার মধ্যে একটী দাড়ী গোঁপওয়ালা ছেলে একদিন আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং বলিল 'আমি তোমায় বড্ড ভালবাসি।"

একদিকে এই উৎপাত, অপর দিকে বৈকুণ্ঠ পণ্ডিতের চড় ও বেত্রাঘাত—আমাকে বড়ই বিড়ম্বিত করিয়া তুলিল।

মোট কথা জগন্নাথ স্কুলের ছেলেরা ভারি দুষ্ট ছিল; সেই স্কুলের দোতলা হইতে ** বাজারের ত্রিতল, চৌতল, দীর্ঘরথাকৃতি বাড়ীগুলির ছাদ দেখা যাইত। সেই ছাদে মেয়েরা নগ্ন দেহে স্নানান্তে কাপড় শুকাইতে দিত কিম্বা সিক্ত কাপড় ছাড়িয়া শুষ্ক শাড়ী পরিত—আমাদের ক্লাসের ছেলেদের মধ্যে অনেকে তখন জানেলায় ভিড় করিয়া ঐ সকল মেয়েদের দেখিত ও ঠাট্টা বিদ্রূপ করিত। আমি ও কুমুদিনী—সে সকল হাসির অর্থ বুঝিতাম না, কিন্তু ছেলেরা যে দুষ্টুমি করিতেছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়া

উহাদিগকে ঘৃণা করিতাম। আমাদের সঙ্গে পড়িত শিবাপ্রসন্ন ও রাসবিহারী। রাসবিহারী এখন কোথায় ওকালতি করিতেছে। দিগিন্দ্র-হাজরার চেহারাটা ছিল ধবধবে মহাদেবের ন্যায়—সে ক্লাসে পড়িয়া কেবলই ঘুমাইত। রজনীপণ্ডিত তাহার উপাধি দিয়াছিলেন lion of sleep(নিদ্রা-সিংহ); সে এখন ঢাকা জজ আদালতে ওকালতি করিতেছে। ক্লাসে ভাল ছেলে ছিল—পূর্ণ রাউত, সে সকল বিষয়েই ভাল ছিল—কিন্তু অঙ্কে ছিল বিশেষরূপ ভাল। আমি যে এনট্রেন্স পাশ করিব, এমন সন্দেহ কেহ ক্ষণকালের জন্যও পোষণ করে নাই, যেহেতু আমি এক শত নম্বরের মধ্যে অঙ্কে তিন চার নম্বর পাইতাম। কুমুদিনীর নম্বর ও প্রায় সেইরূপ উঠিত; কিন্তু আমরা, দুইজনই ইংরেজীতে বেশ ভাল নম্বর পাইতাম।

কুমুদিনী একদিন আমায় বলিল "পূর্ণ এমন কি ভাল ছেলে? আমি আর তুই যদি অঙ্ক ভাল করিয়া কষিতে থাকি, তবে--কি পারব না. আচ্ছা, সেই চেষ্টা করা যা'ক।" এই বলিয়া সে দিন রাত করিয়া অঙ্ক কষিতে সুরু করিয়া দিল, তারপর যে সাপ্তাহিক পরীক্ষা হইল—তাহাতে সে ক্লাসে অঙ্কে তৃতীয় হইল। ছাত্র ও শিক্ষকগণ অবাক্ হইলেন। টেষ্ট পরীক্ষায় কুমুদিনী অঙ্কে প্রথম ও পূর্ণ রাউত দ্বিতীয় হইল,—আলাদিনের প্রদীপ ঘষিয়া অট্টালিকা উঠাইবার মত এই কাণ্ডটা আশ্চর্য্যজনক হইয়া গেল।

ইহার পর কোন অভাবনীয় ঘটনায় কুমুদিনীর সঙ্গে আমার ভাবান্তর হইল—তাহার সঙ্গে কথা বন্ধ করিয়া দিলাম। কুমুদিনী পূর্ণকে পরাজয় করিয়া এণ্ট্রেন্স পরীক্ষায় পোনর টাকা বৃত্তি পাইল—পূর্ণ পাইল দশ টাকা—তারপর কুমুদিনী ঢাকা ছাড়িয়া অন্যত্র পড়িতে গেল, তদবধি তাহার সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, শুনিয়াছি সে সবজজিয়তি করিতেছে।

মুএখন আমার অবস্থা বলিতেছি। আমি কুদিনীর দেখাদেখি অঙ্ক কষিতে

আরম্ভ করিলাম। অঙ্কে আমিও এমন পারদর্শিতা দেখাইলাম যে তাহা যদিও কোন অদ্ভুতরূপ বিস্ময়কর ঘটনা হয় নাই—তথাপি ছাত্র ও শিক্ষক-গণের মধ্যে তা নিয়ে বেশ একটা আন্দোলন হইয়াছিল। একটা ক্লাস—পরীক্ষায় আমি ত্রিশ পাইলাম। অঙ্কের শিক্ষক শরৎচন্দ্র সেন মহাশয় আমাকে বলিলেন "তুমি নকল করিয়াছ"। আমি বলিলাম, "আমি নেহাৎ খারাপ ছেলে নই, যদিও আপনার বিষয়ে দুইতিনের বেশী নম্বর পাই না। পূর্ণ আমার খুব বিশেষ বন্ধু, তার পার্শ্বে বসিয়া চিরকাল আমি দুই তিন পাইয়া আসিয়াছি—যদি নকল করিবার প্রবৃত্তি থাকিত, তবে চিরদিনই বেশী নম্বর পাইতাম"। আমাদের সঙ্গে রসিকবসু নামক এক ছাত্র সার্টের ইস্তিরি করা প্লেট ও কাফের মধ্যে ইতিহাসের সমস্ত প্রয়োজনীয় কথা লিখিয়া তাহার উপর কোট ঝুলাইয়া আসিত। "বড্ড গরম" বলিয়া কোটের বোতাম খুলিত ও হাত হইতে কাফ বাহির করিয়া অবাধে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া যাইত। এই সকল কারণে কিছু কিছু অবিশ্বাসের কারণ না হইতে পারিত, তাহা নয়।

যাহা হউক যে ভাবে অঙ্কের চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তাহাতে টেষ্ট পরীক্ষার পূর্ব্বেই বেশ যোগ্যতা লাভ করিতে পারিতাম—সন্দেহ নাই—কিন্তু এই সাফল্যের একটা অন্তরায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঢাকায় ওলাউঠা

সে ১৮৮১ সন। ঢাকায় তখন যেরূপ ওলাউঠার প্রকোপ হইয়াছিল, সেরূপ উৎকট অবস্থা বড় দেখা যায় না। প্রথমতঃ তাঁতিবাজারের পথে যাইতে "হরিবোল" শব্দে বহু মৃতব্যক্তিকে লইয়া যাইতে দেখিতাম, তখন মড়াটা ডানদিকে কি বামদিকে দেখিলাম, তাহাই নিয়া মনে বিতর্ক করিয়া যাত্রার শুভাশুভনির্ণয় করিতাম,—কচি প্রাণে তখনও ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, তখন থাকিতাম বাবুর বাজারে দীননাথ মুন্সীর হাবিলিতে মেস করিয়া। সেই মেসে মামাদের গ্রামের বহুছেলে থাকিত অবনীশ, মহেন্দ্র, অবিনাশ, প্রভৃতি। মহেন্দ্র এখন ঢাকা জেলা কোর্টের ফৌজদারীর বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উকিল। আমাদের বাড়ীর কাছে,—ছিল রমাপ্রসন্নরায়ের বাসা। তিনিও আমাদের গ্রামের লোক—ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটী করিতেন। তাহার ছোট ভাই উমাপ্রসন্ন আমাদের সঙ্গে জগন্নাথ স্কুলে পড়িত, তাহার চেহারা ছিল কালো খর্ব্ব স্থূল। কলেরা তাঁতিবাজার হইতে সুরু করিয়া ধীরে ধীরে বাবুরবাজার মুখে রওনা হইল। স্কুলে যাইয়া দেখিতাম ক্রমশঃ ছেলে কমিয়া যাইতেছে, তাহারা ভয়ে ঢাকা ছাড়িয়া যাইতেছে। পথে—দোকান-পাটে শুষ্ক ভীতনেত্র লোকগুলি দাঁড়াইয়া কেবল ঐ ব্যারামের কথাই বলিতেছে—সেরূপ ভয় কলিকাতার মত স্থানে হইতেই পারে না। কলিকাতায় কোথায় কি হইতেছে—কে খবর রাখে, শুধু সংবাদপত্র পড়িয়া জানা,—কিন্তু ঢাকার মত ক্ষুদ্র সহরে সে যে কি ভয়—তাহাও কলেরা আবার সংক্রামক। সমস্ত সহরটির উপর একটা মৃত্যুর ছায়া পড়িয়াছিল—সকলের মুখে

কালিমা। একদিন সন্ধ্যাকালে মেসে বসিয়া আছি, উমাপ্রসন্ন আসিয়া বলিল, "আমাদের বাড়ীর পায়খানাটা ভাল নয়—তোদের এখানে যাব।" সে ঘটী হাতে গেল; কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরিল না; দেখিয়া আমরা যাইয়া দেখি সে পায়খানার উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া অজ্ঞান হইয়া আছে, তাহাকে ধরাধরি করিয়া উঠাইয়া আনিয়া বাড়ীতে পৌছিয়া দিলাম। আমরা সারা রাত্রি তাহার সেবা করিতে লাগিলাম; রাত্রি একটা দুইটা পর্য্যন্ত, কাগজী নেবু, ঔষধ, বরফ প্রভৃতির জন্য বাজারে হাটাহাটি করিতে লাগিলাম। তারপর দিন ভয়ে আমরা কিছু খাইলাম না, বেলা ৪টার সময় উমার অবস্থা অতি খারাপ হইল, একেতো সে কালো ছিল—তার উপর চোখদুটি শিব চক্ষুর মত হইল, চুলগুলি চাঁছিয়া ফেলা হইল, গণ্ডের কঙ্কাল উঁচু দেখা যাইতে লাগিল, একটা নেংটী পরা—সে কি ভয়ানক দৃশ্য। আজগর মিঞা হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি সেই অবস্থায় ফুট-বাথের ব্যবস্থা করিলেন। কিন্তু, যাই তাহার পা-দুখানি গরম জলে ডুবানো হইল অমনই প্রাণবায়ু নির্গত হইয়া গেল। সে কি শোকাবহ দৃশ্য! তাহার মাতা প্রায় ৵৫ সের পরিমিত বরফ খণ্ড হাতে লইয়া উন্মত্তভাবে আজগর মিঞাকে ছুঁড়িয়া মারিতে যাইতে-ছেন। আজগর মিঞা কোটের বোতাম খুলিয়া উন্মুক্ত বক্ষে বলিতে-ছেন—"মা, মারুন,—আমি আপনার ছেলের প্রাণের জন্য দায়ী, আমায় মেরে যদি আপনার শোক নিবারণ হয়—তাহাই করুন।" উমাপ্রসন্নের মাতা তখন বরফ খণ্ড ছুঁড়িয়া ফেলিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়ি-লেন। আমরা উমাকে দাহ করিয়া রাত্রি ১১টার সময় মেসের বাসায় ফিরিলাম, সেদিন কেহ জল স্পর্শ করি নাই। রাত্রি দুইটার সময় অবনীশ কাঁদিয়া উঠিল, আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম কি হইয়াছে, সে

বলিল, "কলেরা"। 'কিরূপে হইল, তারত কোন লক্ষণ দেখ্‌ছি না?' সে কাঁদিয়া বলিল আমি সারাদিন কিছু খাই নাই, তবু পেটের মধ্যে কেমন অসোয়াস্তি বোধ করিতেছি। আমি হাসিয়া উঠিলাম। আমরা কেহই এখন পর্য্যন্ত ঘুমাই নাই, ঘুমের ভাণ থরিয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া ছিলাম, প্রত্যেকের মনে হইতেছিল "আমার কলেরা হইল"—কারণ পেটের ভিতর একটা অসোয়াস্তির ভাব সকলেই অনুভব করিতেছিলাম। রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া গেল। পরদিন বেলা ৮টার সময় তৈল গায়ে মাখিয়া আমরা বুড়িগঙ্গায় স্নান করিতে গেলাম। সেইখানেই নৌকা করিয়া সুয়াপুর রওনা হইয়া যাইব, নৌকাতেই রান্না করিব, এই সংকল্প করিলাম। কিন্তু নদীর ঘাটে যাইয়া দেখিলাম, ঢাকা হইতে সুয়াপুরের ভাড়া ২৲ টাকা ২।০, টাকার স্থলে ৩০৲।৪০৲ টাকা হইয়াছে। ভীত সন্ত্রস্ত বহু সহরবাসী নদীর ঘাটে হাজির হইয়াছে ও প্রাণ লইয়া পালাইতেছে; নৌকা আর পাওয়া যায় না; আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। শেষে ঠিক করিলাম, ৩০৲।৪০৲ টাকা দিয়াই নৌকা ভাড়া করিব। এমন সময় বাহির হইতে বুড়িগঙ্গা বাহিয়া একখানি নৌকা আসিল, মাঝিরা সহরের এই উৎপাতের কথা জানিত না। আমরা সাগ্রহে সুয়াপুর যাইতে ভাড়া কত জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বলিল, ৩৲ টাকা। আর দরদস্তর না করিয়া তথনই মেসের বাড়ীতে তালা লাগাইয়া সকলে একত্র নৌকায় উঠিয়া পড়িলাম। ইতিমধ্যে কোথা হইতে শ্যেণ পক্ষীর ন্যায় আমার ভগিনীপতি নবরায় মহাশয় আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "দীনেশ, আমি তোমাকে কিছুতেই বাড়ী যাইতে দিব না, চল আমাদের বাসায়। এবার তোমার পরীক্ষার বৎসর।" আমার বয়স তথন চৌদ্দ। কাঁদিতে কাঁদিতে নবরায়ের বাড়ীতে তাঁতিবাজার গেলাম; পথে বলিলাম "রায়জি আপনি কি জানেন না, আমি মাবাপের এক ছেলে?" তিনি তাঁহার দন্ত-

পংক্তি বাহির করিয়া উপেক্ষাভরে হাসিলেন। আমি ভাবিলাম "মরিবার সময় মায়ের কাছে শুইয়া মরিতে পারিব না, এই আমার অদৃষ্টের লেখা।" সেদিন যে কি ভাবে কাটিল, তাহা আর কি বলিব? একটা উৎকট দুঃস্বপ্নের মত দিনটা চলিয়া গেল। স্কুলে গেলাম, দেখিলাম সহপাঠীরা প্রায় সকলে পালাইয়া গিয়াছে, মাষ্টারবর্গও প্রায়ই অনুপস্থিত। রাস্তা দিয়া আসিতে পথে পথে কেবল 'হরিবোল,' কান্নার রোল, অনাথ ছেলে-মেয়েদের চীৎকার,—দোকান-পাট বন্ধ। "বলহরি" মিষ্ট কথাটা বুকের মধ্যে বজ্রনিনাদের মত বাজিতে লাগিল। সন্ধ্যায় মনে হইল সমস্ত সহরটি ঘিরিয়া ছায়ার মত কে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মানুষ দেখিয়া ভূত বলিয়া ভয় হইতে লাগিল। রাত্রে আসিয়া বাসায় দেখিলাম কৈলাস বাবু চীৎ হইয়া পড়িয়া আছেন, তিনি 3rd yearএ পড়িতেন, নবরায়ের আত্মীয়। এখন তিনি ফরিদপুর জেলা কোর্টের উকীল-সরকার। নব-রায়ের ভৃত্য ডেঙ্গু ও দাসী বামা আমার ও কৈলাস বাবুর কাছে দুইটী পেয়ালা ভাঙ্গের সরবৎ লইয়া আসিল। কৈলাস বাবু এক পেয়ালা খাইলেন, নব রায় এক পেয়ালা পূর্ব্বেই খাইয়াছিলেন। আমি ব্রাহ্মের পুত্র, বলিলাম—"ভাঙ্গ বা কোন নেশা প্রাণান্তেও খাইব না। কলেরা হইলেও নয়।" বাহিরে এই বিক্রম দেখাইয়া মায়ের ঘরটায় একা শুইয়া পড়িলাম। তখন আমার ভগিনী সেখানে ছিল না। রাত্রি দুই প্রহরের সময় পাশের বাড়ীতে উৎকট "বলহরি" চীৎকারে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। ভয়ে আমার ঘুম হয় নাই, একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল মাত্র। আমি সেই তন্দ্রার মধ্যে স্পষ্ট দেখিতেছিলাম, নেংটি পরিয়া উৎকট শিবনেত্রে, মুণ্ডিত মস্তক দোলাইয়া একটা আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিয়া গাঢ় কৃষ্ণ ছায়ার মত উমাপ্রসন্ন আসিয়া আমার পাশে দাঁড়াইয়াছে ও বলিতেছে, "দীনেশ. চল্ আমার সঙ্গে যাবি?"

নিদ্রা ভঙ্গের পর দেখিলাম, আমার সমস্ত শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে, ভয়ে বাক্‌রোধ হইয়াছে, হাত পা নাড়িবার শক্তি নাই। প্রায় আধ ঘণ্টা পরে হাতে পায়ে একটু শক্তি হইলে আমি হামাগুড়ি দিয়া অতি কষ্টে নবরায়ের ঘরের দরজায় কড়া নাড়া দিয়া তাঁহাকে জাগাইলাম। তিনি আমার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইলেন, এবং কৈলাস বাবুর ঘরে আমার থাক্‌বার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া নিজে শুইয়া পড়িলেন। কৈলাসবাবু দেখিলেন—আমার হাত পা একবারে ঠাণ্ডা, আমার মুখে কথা বাহির হইতেছিল না,—জিভটা শুকাইয়া কাঠ হইয়াছে। তিনি লেপ মুড়ি দিয়া আমার হাতে পায়ে নিজের হাত পা ঘসিয়া গরম করিলেন। প্রভাত বায়ুর স্পর্শে আমি যেন নূতন জীবন পাইলাম। এবং সেই দিনই সুয়াপুর রওনা হইয়া গেলাম। বুড়িগঙ্গার হাওয়ার স্পর্শে আমার সমস্ত ভয় দূর হইল। পল্লীমায়ের অঞ্চলের বাতাস আমার গায়ে লাগিল।

সুয়াপুর আসিয়া ভয় দূর হইল,—খুব স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কয়েক দিন কাটিল। পূজার কিছু পূর্ব্বে ঢাকার চিঠিতে জানিলাম, ঢাকায় কলেরার প্রকোপ কমিয়াছে। টেষ্ট পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী, উহা তখন পূজার পূর্ব্বেই হইত। সুতরাং ঢাকায় ফিরিয়া আসিতে হইল—কিন্তু ঢাকায় আসিয়া কলেরার ভয় আবার আমায় পাইয়া বসিল, "হরিবোল" শব্দ রাস্তায় শুনিলেই চমকিয়া উঠিতাম,—পেটের ভিতর সর্ব্বদাই একটা অসোয়াস্তির ভাব অনুভব করিতাম এবং রোজ সন্ধ্যার পর শুইয়া মনে হইত, সেই রাত্রেই কলেরা রোগে মরিয়া যাইব। এই ভয়ে দিনরাত ঔষধ খাইতাম। সালফিউরিক এসিড ডিল পকেটেই থাকিত, শিশির ছিপি খুলিয়া ঔষধ পড়িয়া আমার অনেক আল্‌পাকা ও গরদের জামা জ্বলিয়া গিয়াছে। শুধু সালফিউরিক এসিড নয়, পিপারমেণ্ট, বিছমাউথ, ভুবনেশ্বর, ক্লোরোডাইন, স্পিরিট ক্যাম্ফার প্রভৃতি ঔষধ খাইয়া এমনই পেটের

অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে প্রায়ই আমার কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকিত। এইভাবে ২।৩ বৎসর ঢাকায় কাটাইয়া আমার শরীর একবারে মাটী করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ভয়-জনিত মস্তিষ্কের বিকার, স্নায়বীয় দুর্ব্বলতার দরুণ শিরঃপীড়া ও বাতঃব্যাধি শেষে আমার জীবনটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছিল। ঢাকায় তখন জলের কল ছিল না, কুয়োর জল খাইতে হইত; তাহাতে গলাগণ্ড জন্মিত, এবং সেই জলের গুণে বার মাস কলেরা ঢাকায় লাগিয়াই থাকিত। ঢাকার নামে আমার সেই শৈশবের ত্রাস এখনও আছে। ছোট ছোট দুর্গন্ধ গলি; বৃষ্টি হইলে কলিকাতার গলিতে জল দাঁড়ায়, ঢাকায় সুরকী ও নানা আবর্জ্জনা পচিয়া একটা কাথের মত পদার্থ প্রস্তুত হয়, পদব্রজে চলিলে হাটু পর্য্যন্ত সেই কাথে লিপ্ত হয়। ঢাকায়ই আমার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য হারাইয়া আসিয়াছি। এখন শুনিয়াছি জলের কল হওয়ায় কলেরা কমিয়াছে, কিন্তু অলি-গলির নরকে বোধ হয় যমরাজ তেমনই জোরে প্রভুত্ব করিতেছেন।

১৮৮১ সনের কলেরার মহামারীতে আমার অঙ্কের চর্চ্চা বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় অঙ্কে তিন নম্বর কম হইয়াছিল, শুনিলাম, তদ্দরুণ ৩০ নম্বর অপরাপর বিষয় হইতে কাটা হইয়াছিল এবং এইজন্য আমি তৃতীয় শ্রেণীতে পাশ হইয়াছিলাম।

সাহিত্য-সেবা, কৌতুক ও উৎসব

আমার সাহিত্য-জীবন অতি শৈশবেই আরব্ধ হইয়াছিল। যখন আমার ৭ বৎসর বয়স, তখন আমি পয়ার ছন্দে সরস্বতীর এক স্তব লিখিয়াছিলাম। তৎপর কত যে কবিতা লিখিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা ছিল না। ক্লাসে ভাল ছাত্র না হইলেও পাঠ্যপুস্তক ছাড়া বাহিরের সাহিত্য-চর্চ্চায় আমার সমকক্ষ কেহ ছিল না। আমাদের সুয়াপুর গ্রামের নিকটবর্ত্তী নান্নার গ্রাম হইতে কৈবর্ত্ত-জমিদার অম্বিকাবাবু "ভারত-সুহৃদ্‌" নামক একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। আমার যখন ১০ বৎসর বয়স, তখন সেই পত্রিকায় "জলদ" নামক এক কবিতা লিখিয়া পাঠাই। তাহাতে যাহা যাহা লেখা ছিল তাহার মর্ম্ম এই :—হে মেঘ, তুমি একটুকু কালের জন্য বায়ুর কৃপায় উঁচু জায়গায় উঠিয়াছ বলিয়া এত স্পর্দ্ধা করিয়া যণ্ডের ন্যায় চীৎকার করিতেছ কেন? পরের কৃপার উপর নির্ভর করিও না। যে বায়ু খেলার পুতুলের মত তোমায় কিছুকালের জন্য উঁচু জায়গায় ধরিয়া তুলিয়াছে, সেই বায়ুই তাহার খেয়াল ছাড়িয়া গেলে তোমাকে ঘাড় ধরিয়া মাটীতে নামাইয়া দিবে, সুতরাং পরের আশ্রয়ে এতটা স্পর্দ্ধা ভাল নহে।"

দশ বৎসর বয়সের পক্ষে এ লেখাটা নিতান্ত মন্দ হয় নাই। এই দশ বৎসর বয়সে মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি বাজে বই অনেক পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাস, হেমবাবুর কবিতাবলী, নবীন সেনের অবসর-রঞ্জিনী প্রভৃতি পুস্তকে আমি

কৃতবিদ্য হইয়াছিলাম। আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল স্বর্গীয় দীনেশ-চরণ বসু মহাশয়ের "কবিকাহিনী"—দীনেশবসু মহাশয় তখন ঢাকা জেলার খ্যাতনামা কবি ছিলেন। বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার কবিতার সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। দীনেশ বসু কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়ের অন্তরঙ্গ সুহৃদ্ ছিলেন এবং উক্ত সাহিত্য-রথীর সম্পাদিত বান্ধব পত্রিকার একজন বিশিষ্ট লেখক ছিলেন। মাইনর স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিবার সময় ক্লাসে প্রথম হওয়ায় আমি দীনেশ বসু মহাশয়ের "কবি-কাহিনী" এবং স্যার ওয়াল্টার স্কটের "গ্র্যাণ্ড ফাদারস্ টেল্স" এই দুই বই প্রাইজ্ পাইয়াছিলাম। এই বই দুই খানি দশ বৎসর বয়সে আমি ভাল করিয়া পড়িয়াছিলাম। কবিকাহিনী বেশ বড় কবিতার পুস্তক, ইহার প্রত্যেকটি কবিতা আমার মুখস্থ ছিল। তাহা ছাড়া রামায়ণ-মহাভারত ত আমার জিহ্বাগ্রে ছিল।

ভারত সুহৃদে 'জলদ' কবিতা ছাপা হইলে আমি যশের মুকুট মাথায় পরিয়া যেরূপ গৌরব বোধ করিয়াছিলাম—তাহা বলিবার নহে। ভারত-সুহৃদের সেই সংখ্যাটী দুই বৎসর পর্য্যন্ত আমার পকেটে পকেটে ঘুরিত। পকেট হইতে পত্রিকার একটা অংশ আমি ইচ্ছাক্রমে বাহির করিয়া রাখিতাম—উহার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য। যাহার সঙ্গে দেখা হইয়াছে তাহারই দৃষ্টি যে প্রকারে উহাতে পড়িতে পারে, তাহার চেষ্টা করিয়াছি। এবং যখন কোন ভদ্রলোক আমার নীরব আগ্রহে প্রদত্ত পত্রিকাখানি হাতে লইয়া পাতা উল্টাইয়া শেষে আমার কবিতাটীর নিকট পৌঁছিতেন, এবং আমার নাম দেখিয়া "একি? এটা কি তুই লিখিয়াছিস্?" বলিয়া সাগ্রহে পড়িতে সুরু করিয়া দিতেন—তখন আমি গৌরবে আকাশে যেন মাথা ঠেকাইয়া চুপ করিয়া স্বমহিমায় স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় বসিয়া থাকিতাম।

ইহার পর বিস্তর কবিতা লিখিয়াছি; নিঝুম রাত্রে দিদি মুক্তা-লতাবলী পড়িয়া শুনাইতেন। মুক্তা না দেওয়াতে ক্রুদ্ধ কৃষ্ণ মায়াপুরী নির্ম্মাণ করিয়া বিরহী রাধার স্পর্দ্ধা ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্ণবেত্র হস্তে রাধার অপেক্ষা রূপলাবণ্যশীলা রাজকুমারীরা নিথর রাত্রিতে তাঁহাকে গঞ্জনা ও ঠাট্টা করিয়া অনুতাপ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। সেগুলি দিদি এমনই করুণকণ্ঠে সুর করিয়া পড়িতেন, যেন আমার চক্ষে ছবির পর ছবি ফুটিয়া উঠিত। রাধার দুঃখে শিশুহৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত। সেই স্মৃতি হইতে ৪২ বৎসর পরে আমি গত বৎসর "মুক্তাচুরি" বহি লিখিয়াছিলাম।

তারপর মাইনর ক্লাসে উঠিয়া আমি বাইরণের "চাইল্ড হেরল্ড ও 'ডন জুয়ান' প্রভৃতি পাঠ করি। সকলাংশ না বুঝিলেও যেটুকু বুঝিতাম, তাহাতে আমার কল্পনা আমাকে অনেক দূর লইয়া যাইত। আমি খাতার পর খাতা পূর্ণ করিয়া কবিতা লিখিয়া তৃপ্তি বোধ করিতাম। আমার মনের উপর যে পুলকের বোঝা চাপিয়া থাকিত, তাহা কবিতা রচনা করিয়া নাবাইতে পারিলে যেন আরাম অনুভব করিতাম।

দশ বৎসর বয়সে অবিনাশ এবং আমি একদা আমাদের বাড়ীর ধারে চড়ক-উৎসবের খোলা মাঠটায় দাঁড়াইয়া—জীবনে কে কি করিব তাহাই আলোচনা করিতেছিলাম। অবিনাশ বলিল "আমি জমিদার হইব, শত শত লোক আমার পাছে পাছে ছুটিবে, আমরা এককালে বড় জমিদার ছিলাম, আমি সেই নষ্ট প্রতিষ্ঠার উদ্ধার করিব।" আমি বলিলাম—"আমি কবি বা গ্রন্থকার হইব, কুঁড়ে ঘরেও যদি থাকি, তবে সেই কুঁড়ে ঘরের নিকট যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি মাথা নোওয়াইবেন।" তাহার পর প্রায় ৪২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। অবিনাশ হেমনগরের

(ময়মনসিংহ জেলার) জমিদারের নায়েব হইয়াছে। সে বি, এ ফেল করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। হেমনগরের জমিদারের আয় বাৎসরিক ৪ চারি লক্ষ টাকা। অবশ্য শত শত লোক নায়েব মহাশয়ের পাছে পাছে ঘোরে, এবং যখন জমিদারের প্রতিনিধি হইয়া সে মফঃস্বলে যায়—তখন প্রজাদের নিকট রাজ-সম্মান পাইয়া থাকে।

অবিনাশের সঙ্গে সে দিনও দেখা হইয়াছিল—আমাদের দশ বৎসর বয়সের সে কথা গুলি তাহার বেশ মনে আছে—সে তাহা উল্লেখ করিল।

যদিচ জীবনের নানা পথ অভীপ্সিত মত হয় নাই,—কিন্তু যাহা শিশুকালে ভাবিতাম—এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই মূল লক্ষ্য অবলম্বন করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার পর আমি মনে করিয়াছিলাম, আমি ফেল হইলে বাগ্মিতা শিখিব। এই জন্য দাশোড়ার খালের পাড়ে সন্ধ্যাকালে একা একা বেড়াইতাম ও ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করিতাম ; নিজেকে ডিমস্থেনিসের স্থলে অভিষিক্ত করিয়া হস্তের ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরের কায়দা অভ্যাস করিতাম। যখন সেকেণ্ড-ইয়ার ক্লাসে পড়ি তখন একটা নোটবুকে এই মর্ম্মে লিখিয়াছিলাম—"বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব, যদি না পারি তবে ঐতিহাসিক হইব। যদি কবি হওয়া প্রতিভায় না কুলোয়, তবে ঐতিহাসিকের পরিশ্রম-লব্ধ প্রতিষ্ঠা হইতে আমায় বঞ্চিত করে, কার সাধ্য ?"

জীবনের একটা ধারা কৈশোর হইতে এক ভাবেই চলিয়া আসিয়াছিল। কাব্যানুরাগ দিদি দিগম্বরী দেবী আমায় দান করিয়াছিলেন, তিনি যখন বৈষ্ণবপদ মৃদু স্বরে গাইতে থাকিতেন, তখন আমার মনে যে আনন্দ হইত, তাহা শুধু অশ্রুজলপ্লাবিত হইয়া ভাসিয়া যাইত না, তাহা আমার কল্পনার ঘরে আরতির ঘিয়ের বাতি জ্বালাইয়া

দিত। তাঁহার কণ্ঠের সেই মধুর "রজনী শাঙন ঘন, ঘন দেওয়া গরজন, রিমি ঝিমি শবদে বরিষে" গান আমার চক্ষে বর্ষাকে এক নূতন সজ্জায় সাজাইয়া উপস্থিত করিত।

আমি আমার মাতুলালয়ে এক প্রকোষ্ঠে বহু কাগজ পত্র বিছানায় স্তূপীকৃত করিয়া কবিতা লিখিতে থাকিতাম। হীরালালকে পড়িয়া শুনাইতাম, কিন্তু আমার প্রধান ভক্ত ও শ্রোতা ছিল আমার মাসতুত ভাই দুইটি—গিরীশচন্দ্র ও হেমচন্দ্র। আমি যাহা লিখিতাম তাহাই তাহারা অবাক্ হইয়া শুনিত; কিন্তু আমার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, আমার অপর এক মামাত ভাই ইন্দ্রমোহন। সেও আমার মত কাগজপত্র ছড়াইয়া হাঁসের পাখার কলম ধরিয়া কবিতা লিখিবার জন্য শুভ-মুহূর্ত্তের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিত। সে হংস-পুচ্ছটি মাঝে মাঝে দাঁতে কামড়াইত এবং এই সকল প্রক্রিয়ার দ্বারা কবিতার ভাবকে ঘনীভূত ও সচেষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিত। বাড়ীর অপরাপর ছেলেরা তাহার প্রকোষ্ঠের জানালায় উকি মারিয়া তাহার এই সকল ভাব লক্ষ্য করিয়া চাপা হাসিতে পেট ফাটিয়া মরিবার দাখিল হইত। কারণ সে টের পাইলে রক্ষা ছিল [illegible] না। আমার মাতুলেরা আমায় বলিতেন, "তুই ইন্দ্রমোহনের মাথাটা একবার খেয়ে ফেল্লি।" আমার যে কি অপরাধ তাহা আমি কিছুই বুঝিতাম না।

ইন্দ্রমোহনের কবিতার পদ প্রায় খোঁড়া হইয়া যাইত, অর্থাৎ হয়ত চৌদ্দ অক্ষর হইত না, তা না হইলে শেষের অক্ষরের সঙ্গে উপরকার ছত্রের শেষাক্ষরের মিল অদ্ভুত রকমের হইত। সে একটিও বিমুগ্ধ শ্রোতা পাইত না এবং তাহার কবিতা শুনিলে সকলেই হাসিত। তাঁহার পিতা—আমার বড় মাতুল—আনন্দমোহন সেন, উন্মাদ ছিলেন, সুতরাং তাহারও মাথায় কোন জায়গার একটি কল জন্ম হইতেই বিগড়ানো ছিল। ইহার মধ্যে

একদিন তাহার সামান্য সর্দ্দি জ্বর হইল। অমৃত কবিরাজ মহাশয় তাহাকে সাতটা মহালক্ষ্মী-বিলাসের বড়ি দিয়া বলিলেন,—"একটি খেয়ে ফেল, যদি জ্বর না ছাড়ে তবে আর একটা খেও।" ইন্দ্রমোহন ঔষধ খাওয়ার জন্য স্থির-প্রতিজ্ঞ হইয়া একটা তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া প্রথমত একটি বড়ি খাইল, এবং দশ মিনিটের পর নিজের নাড়ী টিপিয়া কি বুঝিল সেই জানে,—তার পরে আর একটা বড়ি খাইল এবং মিনিট পনের পরে আর একটা খাইল। এইরূপে দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সে সাতটা বড়ি শেষ করিয়া ফেলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী এই কাণ্ডটা দেখিয়াছিল—সে তাহার মাতাকে জানাইল। মাতা ঘুরিয়া কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। তিনি বলিলেন, "আজ সারা রাত্রি উহাকে পুকুরে স্নান করাও, দুই তিনটা লোক যেন ধরিয়া রাখে ও অবিরত মাথায় জল ঢালিতে থাকে,—তাহা হইলে বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে,—কিন্তু অন্য যদি কিছু হয়, তবে আমি আর কি করিব?" সেইরূপ করা হইল, তাহার জীবন রক্ষা হইল—কিন্তু সে একাবারে উন্মত্ত হইয়া সকলকে মার ধর করা সুরু করিয়া দিল—এতদবস্থায় তাহাকে পাগলা-গারদে পাঠান হইল এবং ২৩।২৪বৎসর বয়সে সেই গারদেই তাহার মৃত্যু হইল।

আমার প্রথম কবিতা-রাজ্যের শিষ্যটির উপর মাতা সরস্বতী এই বর দিয়াছিলেন। ক্লাসে এবং পরীক্ষার ফল সম্পর্কে আমার খ্যাতি যেরূপই থাকুক, ঢাকা ছাত্রসমাজে শীঘ্র সকলে জানিত পারিল—আমি ইংরেজী কবিতা ও বৈষ্ণব-পদ ইত্যাদি এত পড়িয়া ফেলিয়াছি, যে কেহই আমার সঙ্গে এই সকল বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। ফার্ষ্ট ইয়ার হইতে সেকেণ্ড ইয়ারে আমি ঢাকা কলেজে ইংরেজী-সাহিত্যে প্রথম হইলাম,এবং তার পর যে সকল সাহিত্যিক সমিতি হইত, তাহাতে আমি সেক্সপীয়র

ও মিল্টন প্রভৃতির বিদ্যা দেখাইয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়া দিতাম। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে আমি এতটা কাঁচা রহিয়া গেলাম, যে আমি যে পরীক্ষা পাশ করিতে পারিব, তাহা কাহারও বিশ্বাস ছিল না।

বাড়ীতে বাজে বই পড়া এবং কবিতা লেখা চলিতে লাগিল! আমাদিগকে ফারশী শিখাইবার জন্য আমার মাতুল চন্দ্রমোহন সেন একজন মৌলভি রাখিয়া দিয়াছিলেন। সারাদিন স্কুলে থাকিয়া এবং নানারূপ সাহিত্য-সমিতিতে প্রবন্ধ পাঠ ও কবিতার আলোচনা করিয়া বাড়ীতে আসিয়া একটু মনের মত আনন্দে কাটাইব, তখন আসিয়া দেখি লম্বা লম্বা সাদা দাড়ী দোলাইয়া ফারশী পড়াইবার জন্য মৌলভি সাহেব বসিয়া আছেন,—বড়ই বিরক্তি বোধ হইত। এক মাস দুই মাস ফারশী পড়ার পর দেশে মাতুলালয় বগজুরী গ্রামে গেলে মাতামহ বলিলেন, "নিয়ে আয় বই, তোরা ফারশী কি শিখিয়াছিস্ দেখ্‌ব।" সশঙ্ক অবস্থায় হীরালালকে অগ্রে করিয়া আমি যাইলাম, কারণ হীরালাল ছিল তাঁর খুব প্রিয়, ঝড়ঝাপ্‌টা যা আশঙ্কা করিয়াছিলাম—তা হীরালালের উপর দিয়া মন্দীভূত অত্যাচারে নিঃশেষ হইয়া যাইবে, এবং আমি তাহার আড়ালে থেকে নিজে ত্রাণ পাইব। এই ভাবে তাঁর কাছে গেলে তিনি প্রথমত বলিলেন, "পড়"। হীরালাল পড়িতে সুরু করিল "আলেফ্ জবর আ, আলেফ জের এ, আলেফ পেশ ও"—অমনই মাতামহ রাগিয়া বলিলেন, "একি হইতেছে ? এ উচ্চারণ ত কিছুই হইতেছে না।"—এই বলিয়া গলার মধ্যে খাদ্যদ্রব্য আট্‌কাইয়া গেলে কিম্বা তালিসাদি চূর্ণ খাওয়ার পর কাশিগ্রস্ত রোগীর গলায় যেরূপ আওয়াজ হয়, সেইরূপ একটা বিকটধ্বনি পূর্ব্বক —সেই কণ্ঠধ্বনিকে সুর করিয়া তালব্য ধ্বনিতে পরিণত করিয়া তিনি এমনইভাবে পড়িতে লাগিলেন যে মৌলভির সাধ্যি কি তাঁর কাছে এগোয়! ফারশী খুব ভাল জানেন বলিয়া তার একটা খ্যাতি ছিল,—

সেই পাণ্ডিত্য-মূলক খ্যাতি আমাদের নিকট বিশেষরূপ প্রতিপন্ন করিবার জন্য তিনি যে গলা দিয়া কতরূপ আওয়াজ বাহির করিতে লাগিলেন, তাহা কি বলিব! কেহ যদি একটা ঢাকের চামড়া দিয়া হারমনিয়াম তৈরী করে এবং মধ্যে চরকা ঘুরণের শব্দ করে—তবে বোধ হয় সেইরূপ একটা অদ্ভুত সুরের কতকটা নকল হয়। কিন্তু ঐ অপূর্ব্ব আবৃত্তি শোনাই আমাদের চূড়ান্ত বিপদ নয়, যদিও হাসি চাপিয়া রাখিতে আমাদের প্রাণান্ত হইতেছিল। ইহার পরে তিনি হীরালালকে সেই সুর নকল করিয়া "আলেফ্ জবর আ" প্রভৃতি আবৃত্তি করিতে বলিলেন। হীরালাল যতই চেষ্টা করিতে লাগিল, ততই তাঁর রাগ বাড়িয়া চলিল; কারণ বুঝিলাম তরুণকণ্ঠে ফারশীর আবৃত্তি হইতেই পারে না। যদি আমার মাতামহ মুন্সী মহাশয়ের সাধা গলার আওয়াজটাই ঠিক হইয়া থাকে—হীরালালের মীহি সুর কি করিয়া সেই উদাত্ত স্বরের নকল করিবে? যদি কেহ তাহার কণ্ঠ সজোরে চাপিয়া ধরিত—তবু না হয় কিছু হইতে পারিত। দুইতিনবার ব্যর্থ প্রয়াসের পর—মুন্সী মহাশয় তাঁহার চটি হাতে লইলেন। চটী জোড়ার দাম বেয়াল্লিশ টাকা, তার মধ্যে অনেক জড়োয়া কাজ ও পাথর ছিল। সেই চটীর কয়েক ঘা হীরালালের পিঠে পড়িল। আমার বয়স তখন ১৫, হীরালালকে প্রহার করিতে যাইয়া তিনিএক একবার আরক্ত নয়নে আমার প্রতি অপাঙ্গ দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমি বিপদ দেখিয়া দে ছুট্। হীরালালও এক লাফে তাঁহার সম্মুখ হইতে পালাইয়া গেল। প্রহার ত কিছুই নয়, কারণ সেরূপ কোমল চটীর আঘাত, উহা ত একরূপ সুখ, এবং যিনি আঘাত করিতেছিলেন, তাঁহার বয়স তখন ৮৫, তাঁহার লোল চর্ম্ম ও জীর্ণ দেহে বা কতটা বল থাকিবে, সে তিনি আমাদের মত স্ফূর্ত্তিমান,—তরুণদিগকে ঘাল করিবেন? কিন্তু মার ধর যাহাই হউক—অপমান ত বটে। আমাদের সমস্ত রাগ হইল মৌলভী বেচারীর উপর।



৺ গোকুল কৃষ্ণ মুন্সী।

ইহার পরে ঢাকায় যাইয়া তাঁহাকে যেরূপ নাকাল করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে মৌলভী সাহেব নিজের নাক কান নিজে মোচ্‌ড়াইয়া "বিসমিল্লা" বলিয়া 'এরূপ ছাত্র প্রাণ গেলেও আর পড়াইবেন না'—ইহা সঙ্কল্প করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন। হাড় জুড়াইল.—কিন্তু মনে হয়, তখন যদি ফারশী পড়িতাম—তবে শেষে কাজ দেখিত। বাড়ীতে যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন মুন্সী মহাশয় রৌপ্য পিকদানিটা সামনে করিয়া বসিয়া কাশিতে কাশিতে আমাদিগকে অনেক গালমন্দ দিলেন, এবং ফারশীর মত যে এমন আশ্চর্য্য জিনিষ জগতে কোথাও নাই তাহা বুঝাইতে যাইয়া নানা ভঙ্গীতে উচ্চারণ করিয়া হাফেজ হইতে

"মর খোর্ মোসাহেফ বসোজ আতস অন্দর কাবাজান,

সাকিনে বুৎখানা বস্ মর্দম আজারি মকুন।" * প্রভৃতি শ্লোক আবৃত্তি করিয়া অর্থ বুঝাইতে লাগিলেন।

ঢাকার বাসায় আমাদের পড়িবার আড্ডাটা কম জমকালো ছিল না। বিদ্যাপতিও চণ্ডীদাসের আমরা যেরূপ চর্চ্চা করিয়াছি, সে কালের ছাত্রদের মধ্যে কেউ সেরূপ করে নাই। প্যারাডাইস লষ্টের অনেক গুলি ক্যাণ্টো তো আমাদের একবারে মুখস্থ ছিল। আমার মাসতুত ভাই জগদীশ বাবু ছিলেন—এ সকল বিষয়ে আমাদের পালের নেতা। তিনি আমার মত বাহিরের বই তত পড়েন নাই সত্য, কিন্তু যে সকল বই তিনি ক্লাসে পড়িয়াছিলেন, তাহা কমা, সেমিকোলেন শুদ্ধ তাঁহার মুখস্থ ছিল। তিনি উত্তর কালে অর্থাৎ ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে এম, এ

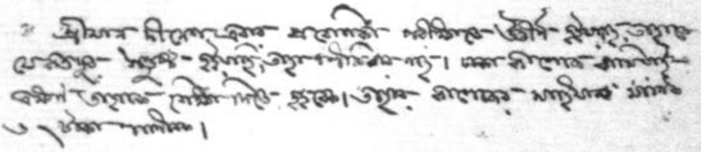
* মদ খাও, কোরাণ পুড়িয়ে ফেল, কাবামন্দিরে আগুণ জ্বালাইয়া দাও, যেখানে পৌত্তলিকগণ থাকে, সেইখানে বাস কর; কিন্তু মনুষ্যের অন্তঃকরণে কষ্ট দিও না।

পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম হইয়া স্বর্ণপদক লাভ করেন। সংস্কৃতেও তিনি প্রথম হইতে পারিতেন, তাহার সে বিষয়েও এতটা দখল ছিল। তিনি যখন দিনাজপুর এন্‌ট্রান্স স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতেন—তখন আমি মাণিকগঞ্জ মাইনর স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীতে পড়িতাম। সেই সময় তিনি অভিধান খুঁজিয়া শব্দ চয়নপূর্ব্বক নানারূপ ফ্রেজ লাগাইয়া চারি পৃষ্ঠার এক ইংরাজি চিঠি আমাকে লিখেন। আমি বহু চেষ্টা করিয়া তাহার এক বর্ণও বুঝিতে পারি নাই। মা জিজ্ঞাসা করিলেন "জগদীশ কি লিখিয়াছে?" আমি ত শুধু—"জগদীশ চন্দ্র সেন" ও "মাইডিয়ার দীনেশ" এই দুটী কথা বুঝিতে পারিয়াছিলাম। মার প্রশ্নে মুখ কাচু মাচু করিয়া বলিলাম—"লিখিছে, ভাল আছে।" মা বলিলেন "এত লম্বা চিঠিতে কি "কেবল আমি ভাল আছি, এইটুকু লিখিয়াছে?" আমি বলিলাম, "উহাতে আমাদের পড়াশুনাও বইএর কথা আছে—তুমি বুঝিবে না।"

জগদীশ দাদা ভবভূতির "স্থানে স্থানে মুখরককুভো ঝাঙ্কৈর্নির্ঝরাণাং" এবং "কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগাৎ" প্রভৃতি যখন পড়িতেন, তখন আমাদের মনোবীণার তার সবগুলি যেন তাঁহার আবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে বাজিয়া উঠিত। শকুন্তলা তো—তাহার ছিল জিহ্বাগ্রে—"গচ্ছতি পুরঃশরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ" প্রভৃতি শ্লোক আওড়াইয়া তিনি এমনই একটা ভাবের আবেশ দেখাইতেন যে, শ্লোকগুলি তাঁহার আবৃত্তি শুনিয়াই আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। আবার অঙ্ক কষিবার সময় গুন্ গুন্ করিয়া গাইতেন "মুখরমধুরং ত্যজ মঞ্জীরং।" সমস্ত "গীতগোবিন্দ" খানি তাঁহার মুখস্থ ছিল। আমরা ত কথায় কথায় "Takes away the rose from love's fore head and sets a blister there," কিম্বা "All hopes

abondon ye who enter here" প্রভৃতি সেক্সপীয়র এবং ডান্টের পদ দিন রাত কথায় কথায় উদ্ধৃত করিতাম। সেক্সপীয়রের হ্যামলেট, ম্যাকবেথ, ওথেলো, কিংলিয়ার—এই চারিখানি নাটক আমার প্রায় আগাগোড়া মুখস্থ ছিল। ইহা ছাড়া বেন জনসন্, মরলি, জন ওয়েবষ্টার, ফিলিপ মেছেঞ্জার, ফোর্ড প্রভৃতি এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যকারদের সঙ্গেও বিশেষরূপ পরিচিত হইয়াছিলাম। আমাদের কলেজে সাহিত্য-সভায় এবং ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া যখন আমি হলিনসিয়ডের ক্রনিকল এবং মারলোর Edward II. এর নিকট সেক্সপীয়র কত খানি দায়ী তাহা বুঝাইতাম, তখন আমি ক্লাসে ভাল ছেলে না হইলেও আমার প্রতি সহপাঠীদের বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। দিন রাত্রি ইংরাজি কবিতা পড়িতাম। চ্যাটারটনের "Death of Charles Badwin হইতে আরম্ভ করিয়া টেনিসন ও ব্রাউনিং পর্য্যন্ত আমি কিছু বাদ দেই নাই। ভিক্টর হিউগো হইতে আরম্ভ করিয়া ডাউডনের "Shakespeare's mind and art" প্রভৃতি সেক্সপীয়র-সংক্রান্ত সমস্ত সাহিত্য আমাদের নখাগ্রে ছিল। আমি যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি, তখনই টেইন্ দুই তিন বার পড়িয়া ফেলাইয়া ছিলাম, এবং তাঁহারই মত—অথচ প্রাচ্য আলোর নূতন রেখাপাতে উজ্জ্বল করিয়া একখানি ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিব, একদা এই সঙ্কল্প করিয়া নোট সংগ্রহ করিতেছিলাম। এই সময়ে আমার এক অভিন্ন হৃদয় সুহৃদ্ জুটিল, তিনি জগদীশ দাদার ও প্রিয়তম বন্ধু হইয়া পড়িলেন—তাঁহার নাম রামদয়াল মজুমদার। ঢাকা কলেজে তখন অধ্যাপক ছিলেন—নীলকণ্ঠ মজুমদার এম, এ, পি, আর, এস্। তিনি আমাদিগকে কবিতা পড়াইতেন। আমার এত কবিতা পড়া ছিল, যে ক্লাসে আমি তাঁহাকে কতবার শুধু বিস্ময়াবিষ্ট নহে, একটু বিরক্ত ও

করিয়াছি। তিনি মনে ভাবিতেন আমি তাঁহাকে উপেক্ষা করি, এজন্ত এক দিন বলিয়াছিলেন—"your litlle head is full of conceit, তোমার "ছোট্ট মাথাটি অহমিকায় পূর্ণ," এ বলা সত্বেও কিন্তু কবিতার পরীক্ষায় তিনি আমাকে প্রায়ই প্রথম করিতেন। নীলকণ্ঠবাবু ছিলেন স্থূলদেহ, ধীর-গম্ভীর প্রকৃতি, চোখে কালো চসমা পরিতেন। তাঁহার ছোট ভাই রামদয়াল Uberbeg's 'History of Philosoph'y হাতে করিয়া একদিন পাটুয়াটুলী দীনবন্ধুর কাগজের দোকানের সাম্‌নে হাসিয়া হাসিয়া নিজে যাচিয়া আমার সহিত আলাপ করিল। তদবধি দিন নাই, রাত নাই—আমরা একত্র থাকিতাম। আমার মাসীমা—জগদীশবাবুর মাকে—রামদয়াল মা বলিয়া ডাকিত, এবং আমাদের পরিবারের সেও একজন হইয়া পড়িয়াছিল। ইংরাজী-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনায় আমরা এতটা উন্মত্ত হইয়া যাইতাম যে রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত কখন কখনও বুড়িগঙ্গার পাড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া একবার উত্তর হইতে দক্ষিণে আর বার দক্ষিণ হইতে উত্তরে উত্তেজিতভাবে কথা বলিতে বলিতে বিচরণ করিতাম। ফরাসী লেখক ইউজ্বন স্যুর "The Wandering Jew"এর মাদার বাঙ্কের চরিত্র লইয়া আমাদের মধ্যে কত তর্কবিতর্ক গিয়াছে,—ননক্লেটকে ভালবাসিয়া গুই-নিভির ভাল করিয়াছিলেন কিমন্দ করিয়াছিলেন, শিলারের "দি রবারসে'র দস্যু-চরিত্র কি পাঠককে উন্নত করে অথবা নীচু করে, ইত্যাদি কত রকম আলোচনা যে আমাদের মধ্যে হইত তাহার ঠিক নাই, তখন আমরা সাহিত্যকে যেরূপ প্রাণের বস্তু বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম—এখনকার ছেলেরা তাহার সিকি অংশও করে কিনা সন্দেহ—এখন বঙ্গীয় যুবকের রঙ্গমঞ্চ হচ্ছে কার্য্যক্ষেত্র,—কর্ম্ম-জীবনের বিরাট আদর্শ তাদের সাম্‌নে। আমাদের সময়ে সাহিত্য-চর্চ্চাই সেই স্থান লইয়াছিল।



গ্রন্থকারের ভগিনী মগ্নময়ী দেবীর নিকট বাং ১২৮৯ সনের ২৯শে পৌষ তারিখে পিতা ঈশ্বরচন্দ্র সেনের স্বহস্ত লিখিত পত্র হইতে উদ্ধৃত হইল, ইহাতে গ্রন্থকারের প্রবেশিকা পাশের কথা আছে।

আমি যখন প্রথমবার্ষিক শ্রেণীতে পড়ি, তখন অক্ষয় সরকারের নবজীবন প্রথম প্রকাশিত হয়। সে বোধ হয় ১৮৮৩ সন হইবে, তখন আমার বয়স ১৫। সেই বৎসরই আমার একটা কবিতা--"পূজার কুসুম"—নবজীবনে প্রকাশিত হয়। তখন নীলকণ্ঠবাবু নবজীবনে লিখিতেন। ঢাকার এক পঞ্চদশবর্ষীয় বালক এরূপ প্রতিষ্ঠাপন্ন পত্রিকায় লিখিতেছে—দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঢাকা কলেজে পড়ার সময় আমি এত কবিতা লিখিয়াছি এবং তাহার গোড়া এত লোক ছিল—যে আমার অতিরঞ্জিত ভাবী-সাফল্য সম্বন্ধে আমার ভাই গিরীশ ও হেম যেরূপ স্বপ্ন দেখিত, দয়াল ও সহাধ্যায়িগণের অনেকেই উহা সেইরূপ বিশ্বাস করিত। ইতি মধ্যে রামদয়ালকে আমি উস্কাইয়া তাহার এক কবিতা পুস্তক "সখিনা" প্রকাশিত করাইয়াছিলাম। কারাবালা ক্ষেত্রের বর্ণনাটি বড় সুন্দর হইয়াছিল। সখিনা বাঙ্গালী-ঘরের মৃদু-স্বভাবাপন্ন লাজুক মেয়েটির মত চিত্রিত হইয়াছিল এবং কাশিমের সঙ্গে তার প্রেম—ঈষৎ বিকশিত কুন্দ কোরকের ন্যায় অন্তর্নিহিত সুবাস লইয়া যেন আত্মপ্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছিল। "সখিনা" এখন সব ফুরাইয়া গিয়াছে। রামদয়ালকে সেদিন ও জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, সে বলিল তাহার কাছে ও এক খানি নাই।

আমি ইংরাজি সাহিত্যের যে ইতিহাস লিখিবার পরিকল্পনা করিতেছিলাম, তাহা এই জন্য যে বিলাতী আদর্শটার প্রাচ্য আদর্শের দ্বারা তুলনা-মূলক বিচার আবশ্যক। সাহেবেরা আসিয়া তো সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের বিচার মাথা পাতিয়া নেন না। তাঁহারা বুঝুন আর না বুঝুন, খুব স্পর্দ্ধার সঙ্গে আমাদের বড় বড় কবিদিগের টিকি ধরিয়া নাড়া দিতে ছাড়েন না, এমন কি কবিগুরু

বাল্মীকির কথা লইয়াও কত অহমিকা পূর্ণ আলোচনা করেন ; বিলাতি মাপকাটি লইয়া আসিয়া আমাদের ঘরের ঠাকুরদের প্রতি অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশ করেন। চৈতন্যকে পাগল বলিয়া সাব্যস্ত করেন— আমাদের বিরাট অলাঙ্কার শাস্ত্রের রীতি ও নীতির আদর্শ আয়ত্ত করিয়া বুঝিবার যোগ্য তাঁহাদের মাথাই বা কোথায়, অবসরই বা কোথায় ?—যা, তা, সমালোচনা করেন এবং তাহাই আমরা বেদ-কোরাণ বলিয়া মানিয়া লই। কিন্তু তাঁহারা যখন সেক্ষপীয়র ও মিল্টনের ডঙ্কা বাজাইয়া যান, আমরাত তখন মসগুল হইয়া তুড়ি মারিয়া তাল রাখি। আমি মনে করিয়াছিলাম—তাঁহাদের সাহিত্যের আলোচনা আমি আমাদিগের দিক হইতে করিব। তাহার উদ্দেশ্য নয়, প্রতিহিংসা-বৃত্তি প্রণোদিত হইয়া তাঁহাদিগকে খাটো করিবার চেষ্টা। আমাদের দেশ তো সাহিত্য সম্বন্ধে অন্ততঃ পাঁচ সাত হাজার বৎসর চিন্তা করিয়াছে, আমাদেরও তো একটা আদর্শ আছে। তাহাদের সাহিত্যে যা কিছু হইবে—যত কিছু আবর্জনা ও সরস্বতীর পাদপীঠের উপর দৌরাত্ম্য—সমস্তই আমরা "বিশ্বসাহিত্য" বলিয়া মানিয়া লইব এবং আমাদের জিনিষ না বুঝিয়া সে গুলি সংকীর্ণ গণ্ডীর কথা বলিয়া উড়াইয়া দিব—এটা কখনই সমীচীন নহে। ধরুন আমি Lord Byronএর মধ্যে এমন অনেক জিনিষ পাইতেছি—যাহা তাঁহার সমস্ত অসংযম ও স্বেচ্ছাচারিতার মধ্য হইতে ঘন-নিবিড় মেঘব্যূহের মধ্য হইতে বিদ্যুৎস্ফূরণের মত—তাঁহার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম-প্রাণতা পরিস্ফুট করিয়া দেখাইতেছে। প্রকৃতির সেই সাধুত্ব, আত্মার সেই উজ্জ্বল গৌরব,—তাহার কবিতার কোটি কোটি অবস্থায় আছে, তিনি অল্প বয়সে মৃত্যুমুখে না পড়িলে বোধ হয়, সেই জিনিষটা সম্যক বিকাশ লাভ করিতে পারিত। চাইল্ড হেরল্ডে এমন কি ডন-জুয়ানের মধ্যেও আত্মার মহান্ শক্তির প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিতময় বহু

কথা আছে। মানুষের মনই যে প্রেমের চক্ষে চাহিয়া রূপ গড়িয়া লয়, বাস্তবিক রূপবান্ কি রূপসীর দেহে তাহা নাই—কিম্বা যেটুকু আছে, তাহা ক্ষুদ্র উপলক্ষ্য মাত্র, এই কথা কেমন সুন্দর করিয়া চাইল্ড হেরল্ডের তৃতীয় অধ্যায় লেখা আছে। ডনজুয়ানের নানা কুরুচিপূর্ণ অসঙ্গতির মধ্যেও সন্ধ্যাবর্ণনায়, আত্মার শক্তি যে কতবড়, মানবাত্মা যদিও ক্ষুদ্র বারি বিন্দুর ন্যায়—তাহা যে বিশাল বারিধিরই স্বরূপ দেখাইতেছে, তাহা তিনি এমন সুন্দর করিয়া বুঝাইয়াছেন যে আমার মনে হয় তাঁহার লেখায় প্রাচ্য মনের যে সাড়া পাওয়া যায়, তাহাতে আমরাই সেই সকল অংশের ভাল সমালোচনা করিতে পারিব। অথচ এই সকল বিষয়ে তাঁহার ইংরেজ সমালোচকগণ প্রায় নির্ব্বাক, তাঁহারা বেশী বুঝিয়াছেন বাইরণের সেই দিকটা যাহা ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অভিব্যক্তি, সমাজের প্রতি স্পর্দ্ধাপূর্ণ চোখ-রাঙ্গানি এবং অকুণ্ঠিত একান্ত নির্ভীকতা। সুতরাং আমরা ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিলে তাহা যে সেই জিনিষটাকে খাটো করিয়া দেখাইবার চেষ্টায় পর্য্যবসিত হইত তাহা নহে, অবশ্য সেক্সপিয়র যে তাহার হ্যামলেট নাটকের শেষাঙ্কে একত্র ছয় সাতটা হত্যা করিয়া গ্রীক বিয়োগান্ত নাটকের রীতি রক্ষা করিলেন, এবং কিং জনে যে বালক আর্থারের চক্ষু দুটি উত্তপ্ত লৌহশলকা দ্বারা তুলিয়া ফেলিবার জন্য উদ্যোগ চলিল—তদ্দ্বারা নাট্যসম্রাট বৃথা শোক উদ্দীপনার চেষ্টা করিলেন এ সকল হয়তঃ আমরা প্রশংসা করিতে পারিতাম না। কারণ যে দুঃখ মনে শুধু ঘা দেয়, কিন্তু চিত্তকে উন্নত করে না—যে দুঃখ ত্যাগের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া নাই, এমন দুঃখ বর্ণনা করা আমাদের সাহিত্য-নীতির বিরুদ্ধ। যাহা হউক যখন ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস আমি লিখিলাম না, তখন এসকল কথার প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন।

একদিকে লেখা পড়ার এই ঐকান্তিকী চেষ্টা ও অপরদিকে বাড়ীতে

নানারূপ দুষ্ট বুদ্ধির প্রণোদনে অশিষ্টাচরণ--পাঠ্যপুস্তকের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক রহিতত্ব—এই ছিল আমার কলেজ-জীবনের ইতিহাস। আমাদের এই সকল দুষ্ট ব্যবহারের উদ্ভাবনী শক্তি জোগাইত, মহেন্দ্র-প্রতিভা। মহেন্দ্র আমার মামাত ভাই। আমাদের ঢাকার বাসায় শশাঙ্কমোহন নামক এক কায়স্থ যুবক থাকিত, সে একটু পাগ্লাটে ছিল এবং অল্পেই এমন ক্রুদ্ধ হইত, যে সে আমাদের আমোদের একটা কেন্দ্রস্থান হইয়া পড়িয়াছিল, আমাদের দুষ্টামির দুর্গোৎসব হইত তাহাকে লইয়া। মহেন্দ্র একদিন একটি গল্প তৈরী করিল এবং সেটি এমন প্রত্যক্ষ ঘটনার ন্যায় বর্ণনা করিতে লাগিল যে কথাটা একান্ত অদ্ভূত রকমের হইলেও বাহিরের লোক তাহা বিশ্বাস করিতে লাগিল ও শশাঙ্ক তাহাতে চটিয়া প্রায় ক্ষেপিয়া যাইবার মত হইল।

ঘটনাটা এই,—একদিন বৈঠকখানা ঘরে অতি বিমর্ষভাবে মহেন্দ্র বসিয়াছিল। বাহিরের লোক একজন আসিয়া তাঁহাকে সেইরূপ বিমর্ষ থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করিল, তখন শশী (শশাঙ্ক) ও আমরা সেইখানে বসিয়াছিলাম।

মহেন্দ্র বলিল "মহাশয়, দুঃখের কথা কি বলিব! আমার একটা পোষা শালিক ছিল, সে এতটা পোষ মানিয়াছিল, যে আমি প'ড়তে বসিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতাম সে ডানা দুইটা বিস্তার করিয়া ধীরে ধীরে উড়িয়া আমার বাহুমূলে—কাঁধের উপর এবং মাথার উপর বসিত। দুই চারটা চা'ল কি ধান ছড়াইয়া দিলে সে মাথা নাড়িয়া আমাকে দেখিত ও লাল দুটি ঠোঁট দিয়া তাহা কুড়াইয়া খাইত ও এমন চমৎকার শীষ দিতে থাকিত, যে তাহা শুনিলে আমি তাহাকে আস্তে ধরিয়া ঠোঁটে চুম খাইতাম, এমন কি কুকুরের মত সে আমার পেছন পেছন হাঁটিয়া চলিত, আমি ফিরিয়া ফিরিয়া সেটাকে দেখিতাম,—তখন আমার

মনে যে কি আনন্দ হইত তা আর কি বলিব! পাখীটা আমার প্রাণ ছিল।" মহেন্দ্র এই খানে চক্ষু মুছিবার ভাণ করিল খানিকটা চুপ করিয়া রহিল; তারপর বলিতে লাগিল। "গত শনিবার বৃষ্টির পর একটু ঠাণ্ডা হয়, তারপর রৌদ্র উঠিলে আমি পায়খানার সংলগ্ন উত্তর দিকের ছাদটার উপর খাঁচাটা শুদ্ধ পাখিটাকে রাখিয়া যাই। একটু রোদ লাগিলে পাখীটা আরাম পাইবে, এই ছিল উদ্দেশ্য। মহাশয়, কি বলিব! প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে, ২টার সময় বাড়ী আসিয়া দেখি খাঁচা খালি,—শালিকটা নেই। খাঁচার দোর বন্ধ ছিল। বেড়ালে নিয়ে যাওয়ার যো ছিল না। আর পাখীটা এত পোষা যে উড়্‌তে ভুলিয়া গিয়াছিল—সুতরাং তার নিজে উড়িয়া যাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। আমি পাগলের মত বাড়ীর ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলাম, কেহই কিছু সন্ধান দিতে পারিল না। তবে দুর্গা-দাস মজুমদার মহাশয় বলিলেন, 'বাপু, আমি পায়খানায় গিয়াছিলাম, তখন পাখীটাকে খাঁচায় দেখিয়াছিলাম, ইহার মধ্যে টের পাইলাম, শশী একটা ঝড়ের মত পায়খানার পাশ কাটিয়া ছাদে চলিয়া গেল এবং তারপর একটা চিঁচিঁ, চিঁচিঁ শব্দ হইল। পাখীটা প্রাণান্ত কষ্টে চীৎকার করিতেছিল, আমি যখন বাহিরে আসিলাম, তখন দেখিলাম, ছাদের উপর খালি খাঁচাটা পড়িয়া আছে ও শশী দ্রুতবেগে পালাইয়া যাইতেছে, তাহার ঠোঁটের কাছে পাখীটার একটা পালক লাগিয়াছিল!' বলা বাহুল্য গল্পটা আগাগোড়া তার তৈরী। গল্পটি বলিয়া মহেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বসিয়া রহিল। শশীর চোখের রক্তিমা গাঢ় হইতে-ছিল। সেই ব্যক্তি বলিলেন, "শশীবাবুর মাথাটা চিরকালই একটু গরম, তাই বলিয়া কি পাখীটার কাঁচা মাংস উনি খাইয়া ফেলিলেন, বায়ুরোগ—তোমার লীলা আশ্চর্য্য!" এই কথা শুনিয়া হঠাৎ একটা লাফ মারিয়া

শশী মহেন্দ্রের গণ্ডদেশে একটা চড় মারিল—মহেন্দ্র ও আমরা ভয়ে পালাইয়া গেলাম। কিন্তু সেই দিনই আমাদের জিন্দাবহরের গলিতে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে শশী শালিক মারিয়া খাইয়াছে। এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম্মানভিজ্ঞ ব্যক্তিরা সরল বিশ্বাসে শশীকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন "সত্য সত্য কি তোমার বুদ্ধিটা লোপ পাইয়াছিল—এমন কাণ্ডটা করিয়া ফেলিলে?" শশী তখন লগুড় লইয়া প্রশ্নকারীদিগকে তাড়া করিয়া ছুটিল।

শশী কচ্ছপকে জন্মাবধি ঘৃণা করিত। জিন্দাবহরের গলিতে আমার মাতুলালয়ের একটা জায়গায় বরিশাল নিবাসী কয়েকজন ব্রাহ্মণ বাসা করিয়াছিলেন, তাঁহারা বড়ই কচ্ছপ মাংসপ্রিয় ছিলেন। কচ্ছপের মাংস ও ডিম তুলিয়া লইয়া তাঁহারা সেই জীবের খোলসটা এবং নাড়ী-ভূড়ি-শুদ্ধ মাথাটা ফেলিয়া দিতেন। একদা মহেন্দ্রের শিক্ষা ক্রমে জগদীশ দাদা সেই মাথা সমেত নাড়ী ভূড়িটা শশীর পকেটে পুরিয়া রাখিয়াছিলেন। শশী বাহিরে গিয়াছিল, পরিশ্রান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আল্‌নায় ঝুলানো কোটটা অতিরিক্ত ভারি দেখিয়া পকেটে সেই বীভৎস দ্রব্যটা আবিষ্কার করে। অমনই "চক্ষু ঘোরে যেন নাট, হাত নাড়া ঘন ডাক্, চমকে সকল পুরজন" অবস্থাটি হইল। সে এক হাতে সেই অস্পৃশ্য বীভৎস-দর্শন বস্তুটা এবং অপর হস্তে লগুড় লইয়া দাদকে যে ভাবে তাড়া করিয়াছিল, তাহা না দেখিয়াই কাশীদাস কিরূপে লিখিয়াছিলেন—"পৃথিবী বিদার হয় চরণের ভরে। ক্রোধ দৃষ্টিতে যেন জগৎ সংহারে॥ গজেন্দ্র মারিতে যেন ধায় মৃগপতি"—সেইটি আশ্চর্য্য বটে।

এই সকল দুষ্টামিতে আমরা নিত্য নিযুক্ত ছিলাম। বগজুরীর মাতুলালয় অতি প্রকাণ্ড ছিল,খুব বড় কোন রাজবাড়ীর মত। বাড়িটি

প্রায় ৩০।৪০ বিঘা লইয়া, তন্মধ্যে প্রায় ৪।৫ বিঘা শুধু ফুল বাগানই ছিল, অনেকগুলি মালী সেই ফুলবাগানে কাজ করিত। প্রাতঃকালে বাগানে গেলে ভ্রমরের ডাকে কাণে মধুবর্ষণ করিত; সদ্য প্রস্ফুট নানাজাতীয় গোলাপের লাল রঙ্গে চক্ষু ঝলসিয়া যাইত। তিন দিকে দীঘি,—জল কাক-চক্ষুর ন্যায় কালো ও স্বচ্ছ, নহবৎখানায় উৎসব উপলক্ষে সানাইএর ভয়ঁরো পুরবী প্রভৃতি নানা রাগের আলাপন হইত। দক্ষিণদিকের দোতালার বারেন্দা মস্ত বড়, যেন ঘোরদৌড়ের মাঠ। সেই বারেন্দার নীচে দুই দিকে দুই প্রকাণ্ড ঘর—তাহার একটা পশুশালা আর একটা চিড়িয়াখানা। পশুশালায় বড় বড় হনুমান প্রভৃতি থাকিত, চিড়িয়াখানায় প্রায়ই তিন চারিটী ময়ুর থাকিত। সদর দরজার মধ্য দিয়া সুদীর্ঘ পথ; তাহার দুইদিকে চেয়ারের মত হেলান দেওয়া পাকা গাঁথুনির সুদীর্ঘ বেড়া—তন্মধ্যে বসিবার আসন, তারপর আর একটা বড় গেট্, তাহার দুইদিকে রাজপুত ও মুসলমান সর্দ্দার, হস্তে ঢাল ও তরোয়াল, তথায় প্রাচীরের গায়ে সেকালের নানারকম অদ্ভূত অদ্ভূত অস্ত্র। এই সমগ্র বাড়ীটা আমার মাতামহ গোকুলকৃষ্ণ মুন্সী মহাশয় একটা হাঁক দিলে যেন কাঁপিয়া উঠিত। দুইজন চাকর শুধু তাঁহার গোঁপের তোয়াজ করিবার জন্য নিযুক্ত থাকিত, তাহারা সেই গোঁপের লহরী নানারূপ মাল-মসলা দিয়া তৈরী করিত, সেই লহরীর উপর গোঁপের চুল লতার কায়দায় হেলাইয়া দিয়া অগ্রভাগ ছুঁচের মত সূক্ষ্ম করিয়া গণ্ডের উপর কুণ্ডলী করিয়া লগ্ন করিয়া দিত। সেই গোঁপে তা' দিয়া তিনি যখন তাকিয়া ঠেস্ দিয়া বসিয়া থাকিতেন, তখন—নায়েব, খোসামুদে, মোসাহেব প্রভৃতি সকলে তাঁহার চেহারার তারিফ করিত। "গণিমিঞার ঘড়ি, নীলাম্বরের বড়ি, গোকুল মুন্সীর গোঁপে তা। গল্প শুনবি তো নীলাম্বর মুন্সীর কাছে যা" এই কবিতা ২৫ বৎসর পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গের

সর্ব্বত্র প্রবাদ বাক্যের ন্যায় ছিল। আমি ছিলেট, ত্রিপুরা প্রভৃতি যে অঞ্চলে গিয়াছি সর্ব্বত্রই মাতামহের নাম করিয়া সম্মান লাভ করিয়াছি— "গোকুল মুন্সীর গোঁপে তা" সকলের মুখেই শুনিয়াছি। তাঁহার নাটশালার মত এরূপ বড় নাটমন্দির বঙ্গদেশে খুব অল্পই দেখিয়াছি। তাঁহার দুর্গামণ্ডপ যেরূপ সারি সারি নানারূপ মুসলমানী ও প্রাচীন হিন্দুশৈলের কায়দায় প্রস্তুত স্তম্ভ দ্বারা সজ্জিত হইয়া একটা জমাকালো ভাব দেখাইত সেরূপ হয়ত মফঃস্বলের কোন কোন রাজবাড়ীতে থাকিতে পারে, কিন্তু সেই দুর্গামণ্ডবে দুর্গাদেবীর যে মৃণ্ময়ী-মূর্ত্তি গোলক দেউড়ী তৈরী করিত অত বড় বিরাট-মূর্ত্তি বঙ্গদেশের কোথায়ও দেখিতে পাই না। একশ ভরির সোনার মুকুট মাথায় পরিয়া যখন ডাকের সাজে সাজিয়া সেই মূর্ত্তি সপ্তমীর দিন বোধনের সময় সমবেত বহুশত লোকের চক্ষুর সামনে দাঁড়াইতেন, তখন শুম্ভ নিশুম্ভ-বিজয়ী, পাশাঙ্কুশ, ঘণ্টা, খেটক, শরাসন অসি, চক্র, শূল শর হস্তে যেন সত্যই জগন্মাতা আমাদিগকে দেখা দিতেন। আরতির ধোঁয়ায়, ধূপ ও অগুরুর সুগন্ধে একশত পঁচিশ বাতি ঝাড়ের আলোকে—সেই মূর্ত্তির উজ্জ্বল স্বর্ণবিন্দু মাখা উত্তরীয় অঞ্চল যেন ঝলমল করিতে থাকিত। নর্ত্তকী, বাদ্যকর, কাঁসর বাদক—যেন তাহাদের জন্মাবধি অর্জ্জিত নৈপুণ্য শুধু জগন্মাতাকে দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করিতে প্রাণপণে লাগিয়া যাইত। নর্ত্তকীর অঙ্গভঙ্গী, বাদ্যকরের বাদ্য শুধু সেই বিগ্রহকেই লক্ষ্য করিত। মানুষকে দেখানো যেন তাঁহাদের অভিপ্রেত নয়। সেরূপ দেব-নৃত্য ও দেব-সংগীত—সেরূপ ঐকান্তিকী ভক্তি আর কোথায় দেখিব! এই যুগ হইতে তাহা চলিয়া গিয়াছে।

দোলের সময় ফাগ লইয়া যে ঘটা হইত, তাহাও একটা বর্ণনীয় বিষয় বটে। আমরা ফাগ লইয়া যে কত লোকের চক্ষে মারিয়াছি তাহার অবধি নাই। একবার পুলিশের কতকগুলি লোকের উপর

ফাগ লইয়া অত্যাচার করাতে তাহারা আমাদের ভয় দেখাইয়া ছিল। তাহাতে আমাদের লোকের হাতে তাহারা ভয়ানক মার খাইয়া ছিল—কিন্তু নালিস করিতে সাহস পায় নাই, শুধু মাতামহের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদারের ভয়ে নহে—সেকালে দোলের ফাগ খাওয়া একটা রীতি ছিল - এই রীতির বিরুদ্ধে কেহ কিছু করিতে চাহিত না এবং এতৎ সম্বন্ধে বিপক্ষতা করিলে সমাজে নিন্দিত হইতে হইত। দোলের সময় মনে পড়ে আমরা বাহির খণ্ডের সুবৃহৎ হল্ ঘরটায় ২০।৩০টী ছেলে সকালে শুইয়া আছি, চাকরেরা নেকড়া ও জলের ঘটি লইয়া প্রত্যেকের চক্ষু খুলিয়া দিতেছে। কারণ পূর্ব্বদিন ও পূর্ব্বরাত্রে এত ফাগ আমাদের চোখে পড়িত, যে পরদিন চোখের ছুটি পাতা একবারে আট্কাইয়া যাইত। ভৃত্যদের সাহায্যে চক্ষু না খুলিলে—চোখ বুজিয়া থাকিত। মহেন্দ্রদা ফাগ নিক্ষেপে ওস্তাদ ছিল। আমার চক্ষে যে সে কতবার ফাগ মারিয়াছে,—যাতে করে আমি পৃথিবীটা প্রায় গোলকধাঁধার মত দেখিয়া নিজেকে সাম্লাইতে না পারিয়া মাটিতে পড়িয়া গিয়াছি, তাহার অবধি নাই। কিন্তু আমি যদি যাচিয়া ভাব করিয়াছি, তবে সে আর আমার প্রতি ফাগ ছুঁড়িয়া মারে নাই। তথাপি তাঁহার পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের কথা মনে করিয়া আমি ও হীরালাল তাহাকে সর্ব্বদা জব্দ করিবার সন্ধানে থাকিতাম। তাহার সঙ্গে বাহ্যিক ভাব করিয়া পেছন থেকে যাইয়া হঠাৎ চোখে ফাগ ছুঁড়িয়াছি,—কিন্তু সে এমনই চালাক ছেলে, যে আমাদের ফাগ কোন কালেই তাহার চোখের উপর যাইয়া পড়িত না, চোখের পাশ কাটিয়া গণ্ডের উপর শুধু ক্ষণস্থায়ী রক্তিমায় পুষ্পবৃষ্টি করিয়া যাইত। কিন্তু বিশ্বাস-ভঙ্গের প্রতিহিংসায় তাহার চোখ ছুটি বাঘের চোখের ন্যায় জ্বলিতে থাকিত, এবং আমরা তাহাতে প্রমাদ গণিতাম। কারণ যেরূপ সাবধানতার সহিতই না কেন তাহাকে

এড়াইতে চেষ্টা করিতাম, কোনরূপ ফাঁক পাইয়া সে চিলের মত ছোঁ মারিয়া হঠাৎ চোখে এমনই জোরে ফাগের অগ্নিবাণ মারিয়া যাইত, যে প্রকৃতই যেন ক্ষণকালের জন্য চোখ দুটি আগুনের তাপে জ্বলিতে থাকিত। হীরালাল ও আমি মহেন্দ্রদার হাতে যে কত কষ্ট পাইয়াছি, তাহা লিখিয়া উঠিতে পারিব না। যখন "লক্ষ্মী জনার্দ্দন" (মাতুলালয়ের বিগ্রহ) "গস্ত ফিরিয়া" (গোষ্ঠ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) বাড়ীতে আসিতেন, তখন শত শত লোক যে কি আনন্দ করিত, তাহা আর কি বলিব! ফাগে আকাশ লাল হইয়া যাইত, ধূসর-বরণা সন্ধ্যা যেন আপাদ মস্তক লাল চেলীতে আবৃত হইয়া থাকিতেন। যখন "লক্ষ্মী জনার্দ্দনের" সিংহাসন ধাতু-নির্ম্মিত সুন্দর স্তম্ভযুক্ত চৌদলার উপর চড়াইয়া লোকেরা স্কন্ধে বহন করিয়া বাড়ীতে ফিরাইয়া আনিত, তখন আবির-রঞ্জিত দেহে শত শত লোক হাত উঁচু করিয়া গাইত "জয় দে লো রামের মা তোর গোপাল এল ফিরে। এগিয়ে বরিয়ে গোপাল নিয়ে যাও ঘরে।" "বরিয়া" অর্থ বরণ করিয়া। সে যে কি আনন্দ তাহা মুখে বলার নহে, লেখনীতে লিখিবার নহে। অন্তঃপুর হইতে স্ত্রীলোকেরা জয় জয়কার দিতেছেন, শঙ্খ নিনাদ করিতেছেন, নহবৎ বাজিতেছে. বাড়ীর সকলেই মনে করিতেছে, গোপাল সত্যই ফিরিয়া আসিতেছেন। ঘরের বিগ্রহ দুই এক ঘণ্টার জন্য বাহিরে যাওয়াতে যেন মায়েরা উৎকণ্ঠায় চোখ দুটি পথের পানে ফেলিয়া রাখিয়া ছিলেন। আবির-রঞ্জিত চৌদলার কার্ণিসের পার্শ্বে লাল পতাকা দেখিয়াই তাহারা যেন প্রাণ পাইলেন এবং আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন। এখন যদি আমাদের বাড়ীতে এরূপ কোন উৎসব হয়, তাহা হইলে মেয়েরা হয়ত সেলাইয়ের কলের কাছে বসিয়া সেমিজে লেছ লাগাইতে থাকিবেন এবং উৎসব সম্বন্ধে একবারে অনাসক্ত থাকিবেন,—এটি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে তাহা বিচার করিবার শক্তি আমার নাই, কিন্ত

দেশ হইতে যে একটা প্রকাণ্ড আনন্দ চলিয়া গিয়াছে, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। দুর্গোৎসব-দোলৎসব তাড়াইয়া দিয়াছি—এই যুগের শিক্ষায় পূর্ব্ব সংস্কার ও রুচি নষ্ট করিয়াছি সত্য, কিন্তু সেই সকল উৎসবের জায়গায় আর কোন আনন্দ দিতে পারিয়াছি কি? আনন্দ ভিন্ন যে জাতীয় জীবনের মূল শুকাইয়া যাইতেছে।

———

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

আমি যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি, তখন কালীপ্রসন্ন ঘোষ মহাশয়কে সর্ব্ব প্রথম দেখিয়াছিলাম। সেবার লর্ড রিপণ বিদায় লইতেছেন। সমস্ত বঙ্গদেশ জুড়িয়া তাঁহার বিদায়-সভা চলিতেছে। সেইরূপ এক সভা ঢাকা জগন্নাথ স্কুলের একটা সুদীর্ঘ গৃহে আহূত হইয়াছিল। বক্তা আনন্দ রায় প্রভৃতি, কিন্তু সভার সর্ব্বপ্রধান আকর্ষণ কালীপ্রসন্ন ঘোষ বক্তৃতা করিবেন, এই সংবাদ। কারণ বহুদিন তিনি প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন নাই। ইহার কিছু পূর্ব্বে কৃষ্ণানন্দ স্বামী ও শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়—হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মের পাল্লা দিয়া ঢাকার সভাগৃহগুলিকে খুব সরগরম করিয়া গিয়াছিলেন। কোন লোক কালীপ্রসন্ন বাবুকে যদি যাইয়া বলিতেন "মহাশয় হিন্দু ও ব্রাহ্মদলের বক্তৃতার চোটে আকাশ ফাটিয়া যাইতেছে—আপনি এত বড় বক্তা, আপনি চুপ করিয়া আছেন কেন?" তিনি তাহার উত্তরে উপেক্ষার ভাবে তাঁহার অভ্যস্ত ঝাঁকালো ভাষায় বলিতেন "কাক-কোলাহল।"

সেই দিন বোধ হয় ১৮৮১ সনে হইবে,—আমি কালীপ্রসন্ন ঘোষকে প্রথম দেখিলাম। আনন্দ রায় প্রভৃতি অনেক ব্যক্তি বক্তৃতা করিয়া গেলেন, তাহারা সরল ভাষায় লর্ড রিপণ আমাদের জন্য কি কি করিয়াছেন, আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসন দিতে যাইয়া তাঁহার স্বদেশীয় লোকদের হাতে কিরূপ বিড়ম্বিত হইয়াছেন, এই সকল বলিয়া—তাঁহার ভারত-পরিত্যাগের জন্য দুঃখ করিলেন। সোজা ভাষায় সহজ ভাবে বক্তৃতা

গুলি মন্দ লাগিল না। কিন্তু সর্ব্ব শেষে উঠিলেন কালীপ্রসন্ন ঘোষ, তখনও তিনি "রায় বাহাদুর" "সি আই" "বিদ্যাসাগর" প্রভৃতি পদবী পান নাই। তখন শীতকাল, মোটা পাড়-শূন্য একটা বেগুণে রঙের বানাত তাহার গায়ে ছিল। তিনি যখন বক্তৃতা মঞ্চের টেবিলের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন—তখন দেখিলাম সুদীর্ঘ সুন্দর নাসিকা, উজ্জ্বল গণ্ড, বৃহৎ চক্ষুদ্বয়ে যেন প্রতিভা জ্বলিতেছে। যেমন দীর্ঘ তেমনি স্থূল—বরং স্থূলতার জন্য একটু খর্ব্ব বলিয়া মনে হয়। বিশাল গোঁপের অন্তরালে দুটি রক্তিম অধর, দেখা মাত্র মনে হয়, সেই অধর কথা কহিবার দক্ষতা লইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে, উন্নত করতলটি পদ্মাভ—বর্ণ গৌর, খুব উজ্জ্বল গৌর নয়, সেই বেগুনে রংএর বনাতখানি মর্ম্মর মুর্ত্তিতে যেরূপ বস্ত্রাদির ভাঁজগুলি দেখায়, সেইরূপভাবে বিন্যস্ত হইয়া একটা দিক দিয়া যেন বক্তৃতা-মঞ্চটি ছুঁইয়া আছে। সেই বেগুনে রঙের দীপ্তিতে তাঁহার গৌরবর্ণ যেন ঈষৎ শ্যামল হইয়াছে। যখন দাঁড়াইলেন, তখনই মনে হইল—এ ব্যক্তি শক্তিশালী। তারপর যখন মৃদুস্বরে দুই একটা কথা বলিয়া হঠাৎ ভাষায় অপূর্ব্ব উদ্দীপনা অবতারণা করিলেন, তখন সভাগৃহটি একবারে নীরব ও মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া গেল (ভাষা ওজস্বিনী, বাক্য-গুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড,—সমাস বদ্ধ, কিন্তু তাহার কোন অংশ হীনবল নহে, এ যেন অর্জ্জুন গাণ্ডীবধনু হইতে শর নিক্ষেপ করিতেছেন—সে গাণ্ডীব আর কাহারও ব্যবহার্য্য নহে,—মেঘনাদ বধ কাব্যের মত উন্মা-দনাময়ী ভাষা। ২০ মিনিট কাল শ্রোতারা যেন এক মহাকাব্য শুনিল, সেই কাব্যের শেষভাগ করুণরস মধুর। স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় আমরা সেই বক্তৃতাটি শুনিলাম, বঙ্গভাষার যে কি ভয়ানক শক্তি—সেদিন বুঝিলাম। তারপর ত কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি কত মনস্বী বাঙ্গীর বাঙ্গলা বক্তৃতা শুনিয়াছি, কিন্তু সেরূপ পাহাড় পর্ব্বত

নিক্ষেপকারী দেবাসুরের ক্রীড়ার মত, অবাধস্রোতা ঐরাবত-বিজয়ী দুর্জ্জয় গঙ্গার মত,—বিপুল দম্ভময় মেঘগর্জ্জনের মত, শিবের প্রণব-ধ্বনির মত,—বিজয় দুন্দুভির মত—বঙ্গভাষার ধ্বনি আর কোথাও শুনি নাই। বৈষ্ণব কবিতার মাধুরীতে যে বঙ্গভাষাকে এলাইয়া পড়িতে দেখিয়াছি, কালীপ্রসন্নের বক্তৃতায় সেই ভাষাকে জয়শ্রীমণ্ডিতা সাম্রাজ্ঞীর মত দেখিয়াছি। বঙ্গভাষা যে জগজ্জয়ী হইবে—সেই শিশুকালে একটা অস্পষ্ট আভাসের ন্যায় তখন তাহা মনে হইয়াছিল।

আমি প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে উঠিয়া এপিফেনীতে প্রবন্ধ লেখার জন্য স্মিথ সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলাম, তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। স্মিথ ছিলেন অকস্‌ফোর্ড মিসনের মিসনারি, তিনি অল্প সময়েরমধ্যে সেই মিসনের কাজ খুব জাঁকাইয়া তুলিয়া ছিলেন। তাহার সহকারীছিলেন ব্রাউন ও ডগ্‌লাস। এই ডগ্‌লাস এখন বেহালায় স্কুল খুলিয়া খুব জোরের সহিত প্রচার কার্য্য করিতেছেন।

কিন্তু ইঁহাদের প্রেরণা দিয়াছিলেন স্মিথ;—ইনি খাটো, এবং শীর্ণদেহ ছিলেন—অতি অল্প বয়সেই ইনি প্রাণত্যাগ করেন। স্মিথ সাহেবের ইচ্ছা হইল, আমি ভাল করিয়া বাইবেল পড়ি। তিনি আমার চিঠি পত্র এবং প্রবন্ধাদি পড়িয়া আমার একটু পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়া ছিলেন এবং তাঁহার কেন জানি একটা বিশ্বাস হইয়াছিল যে আমি বাইবেল ভাল করিয়া পড়িলে হয় ত খ্রীষ্টান হইতে পারি। এই ভরসায় ও বিশ্বাসে তিনি আমাকে বিশেষ করিয়া ধরিলেন যে আমাকে বাই-বেল পড়িতেই হইবে। হীরালাল বলিল "ক্ষতি কি? তুমি লিখে দাও—তুমি কবুল আছ।" স্মিথ ঢাকার চাপ্‌লেস আলিয়ট সাহেবকে আমার বাইবল পড়াইতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন; সময়ে সময়ে আমি তাঁহার মেম সাহেবের নিকট ও পড়িয়াছি। আলিয়েট সাহেব খ্রীষ্টান

ধর্ম্মে অতিশয় ভক্তিমান্ ছিলেন। তিনি বাইবেলের প্রতি অক্ষর ঈশ্বরের হাতের লেখা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। জনই লিখুন, আর লুকই লিখুন, সুসমাচারের প্রত্যেক কথায় ঈশ্বরের অনুজ্ঞা আছে--এই কথা আমাকে বুঝাইতেন--সুতরাং প্রতিটী ছত্রের প্রতি তাঁহার ভক্তির উচ্ছাস এত থাকিত—যে বাইবেল পড়া যে খুব অগ্রসর হইত—তাহা নহে। একদিন তিনি ইউকারিষ্ট বুঝাইতে যাইয়া সেই দিনের রুটী খ্রীষ্টের পবিত্র মাংস ও মদ তাঁহারই রক্ত—এই ব্যাখ্যা করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সে কি কান্না! সুতরাং এই ভক্তির অসম্ভব দুর্য্যোগ—ঝড়বৃষ্টি ঠেলিয়া আমার বিদ্যা তরণী মোটেই এগিয়ে গেল না, ঘাটেই নোঙ্গর করিয়া রহিল।

দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে যখন পড়ি, তখন আলিয়েট সাহেব এক দিন আমায় বলিলেন, "কাল লর্ড বিশপ ঢাকায় আসিবেন তুমি শুনিয়াছ? আমি বলিলাম "শুনিয়াছি।"

"কেন আসিবেন, জান?"

"আমি কি করিয়া জানিব?"

"তাঁহার অবশ্য অনেক কাজ আছে, কিন্তু একটি হচ্ছে, তোমাকে পবিত্র ধর্ম্ম দান করা?"

আমি ত এই কথায় অবাক্ হইয়া গেলাম। বলিলাম "আমি খ্রীষ্টান হইব, একথা কাহাকে কবে বলিয়াছি?"

"তবে এই দুই বৎসর যে তোমার পাছে হায়রাণ হইলাম, সে কি সকলই মিথ্যা? আমি যখন আমাদের শাস্ত্র তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছি, তখন ত তুমি ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়াই শুনিয়াছ, তুমি যে ক্রাইষ্ট সম্বন্ধে ইংরাজী কবিতাটি লিখিয়া ছিলে তাহার ভাব তো ভারি চমৎকার! তুমি যে আমাদের শাস্ত্রে বিশেষ ভক্তিমান, তাহাতো তোমার বাইবেল

পড়িবার আগ্রহ দেখিয়া—আমার ব্যাখ্যার সময় তোমার চক্ষু ও মুখ ভঙ্গী দেখিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। আমার স্ত্রী ও আমি তোমার ধর্ম্ম-প্রাণতার কত প্রশংসা করিয়া থাকি। জল ঝড় দুর্যোগের মধ্যে ও তুমি বাইবেল পড়িতে আমাদের এখানে আসিয়া থাক—এ সকল কথা আমি রিপোর্ট করিয়াছি—ইহা করা কি আমার অন্যায় হইয়াছে? যাহা হউক তুমি খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ কর আর না কর, লর্ড বিশপের সঙ্গে পরশ্ব তারিখে ৮টার সময় সরকারী চার্চ্চে দেখা করিও, নতুবা আমি বিশেষ অপ্রস্তুত হইব। আমি বহুদিন তোমায় পড়াইয়াছি—তাহার এই দক্ষিণাটুক চাই যে লর্ড বিসপের নিকট যেন আমি মিথ্যাবাদী ও তিপন্ন না হই, আমি সরলভাবে যাহা বিশ্বাস ক'রতাম তাহাই লিখিয়াছিলাম, এখন তোমার কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছে।"

বিস্ময় যে শুধু তাঁহারই হইয়াছিল এমন নহে, আমার হইয়াছিল ততোধিক। যাহা হউক, আমি লর্ড বিশপের সঙ্গে দেখা করিব, ইহা স্বীকার করিলাম, এবং বলিলাম, যাহাতে তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিষয় লইয়া পাদ্রী-লাটের কোন অপ্রীতিকর ভাব না হয়, আমি তাহা করিব। বিদায় কালে আলিয়েট সাহেব আমায় বলিলেন—'লড বিসপ তোমার ন্যায় বালককে দীক্ষা দিলে জীবন ভরিয়া তুমি এ বিষয় লইয়া গৌরব করিতে পারিবে?—এ বিষয়টি ভাবিয়া দেখিও।''

পরদিন সকালে মহেন্দ্রদের (মহেন্দ্রলাল রায়, ঢাকার উকীল) মেসে যাইয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলাম। সে বলিল 'তোমায় প্রকাশ্যভাবে আলিয়ট সাহেবকে পূর্ব্বেই বলা উচিত ছিল যে তুমি খ্রীষ্টান হইবে না, সাহিত্য ও ইতিহাস আলোচনার জন্য বাইবেল পড়িতেছ—তাহা হইলে সাহেব কখনই তোমাকে বাইবেল পড়াইতেন না। এবং তাঁহার মনেও তোমার খ্রীষ্টান হওয়া সম্বন্ধে আশার সঞ্চার হইত না।

তিনি যাহা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মত সরলচিত্ত বিশ্বাসী ব্যক্তির পক্ষে কিছুই অসম্ভব বা অনুচিত হয় নাই।" আমি বলিলাম "যদি সরকারী চার্চ্চে পাইয়া আলিয়েট সাহেব জোর করিয়া আমাকে জর্ডনের জল খাওয়াইয়া দীক্ষা দেন,—তাহা হইলে কি করিব?" মহেন্দ্র বলিল, "তুমি নিতান্ত পাগল, তাঁহার মত পদস্থ ব্যক্তি এরূপ কার্য্য করিবেন—তাহা কখনও সম্ভবপর নহে।"

আমি আশ্বস্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলাম—কিন্তু এ বিষয়টি আর কাহাকেও জানাইলাম না। পরদিন প্রাতে ৭॥ টার সময় চার্চ্চে গেলাম। সেখানে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিদের ছেলেরা উপাসনা করিতেছিল—একটি বাঙ্গালীর ছেলেও ছিল না। ৮টার সময় ভজনকার্য্যের অবসানের পর সেই ছেলে-গুলি আমাকে নানারূপ উৎপাত করিতে লাগিল; কেহ আসিয়া কানের কাছে শীষ দিতে লাগিল, কেহ আমার কোঁচা ধরিয়া টানিতে লাগিল, কেহ বিকট মুখভঙ্গী করিয়া আমাকে ভেঙ্গচাইতে লাগিল, কেহ বা লাফ দিয়া আমার গায়ের কাছে আসিয়া ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল। ইহার পরে তাহারা মারধর করিবার উপক্রম করিবে—এমন সময় আমি বলিলাম "আমি আলিয়েট সাহেবকে বলিয়া তোমাদিগকে শাস্তি দেওয়াইব" এই কথা বলিতে না বলিতে দেখি আলিয়েট সাহেব উপস্থিত, তাঁহাকে দেখিয়া ছোঁড়া গুলি কেঁচো হইয়া গেল। তিনি আমাকে লইয়া গিয়া লর্ড বিশপের ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং আমাকে চিনাইয়া দিয়া বিদায় লইলেন।

লর্ড বিশপ আমার সঙ্গে এক ঘণ্টা আলাপ করিলেন। দেখিলাম লোকটি অতি ভদ্র ও বুদ্ধিমান, তিনি বলিলেন "স্মিথ সাহেবের নিকট তোমার অনেক সুখ্যাতি শুনিয়াছি, তিনি আমাকে বলিয়াছেন, তুমি যে সকল পত্র লিখ—তাহা খুবই ভাল; অবশ্য আলিয়েট সাহেব ব'লেছেন

তুমি দীক্ষা লওয়ার জন্য সম্ভবতঃ প্রস্তুত আছ। আমরা এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা তোমাকে খুব আন্তরিক সহায়তা দিব—কিন্তু এই কার্য্যে লওয়াইবার জন্য কোন জোর করিব না।” আমি বলিলাম, “আলিয়েট সাহেব আমাকে যত্নপূর্ব্বক পড়াইয়াছেন—হয়ত আমার ব্যবহার এমন হইয়াছে, যে তিনি সহজেই ভাবিতে পারিতেন যে আমি দীক্ষা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, কিন্তু আমি সত্য সত্যই প্রস্তুত হই নাই। আমি এখনও বালক, এত বড় একটা ঘটনার সম্মুখীন হওয়ার মত চিন্তার বিকাশ আমার হয় নাই।”

এইরূপে নানা কথা বলিয়া বিদায় লইলাম. বোধ হইল লর্ড বিশপ আমার কথাবার্ত্তায় প্রীত হইলেন। ইহাতে বিশেষ উৎফুল্ল হইয়া এই সাক্ষাৎকারের প্রসঙ্গ সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইলাম।

এই ঘটনাটি বাড়াইয়া কলিকাতার শ্রীনাথ সেন নামক একজন স্বর্ণ-বণিক-কুলজাত মারচেণ্ট (যিনি বেশ শিক্ষিত ও প্রাচীনবয়স্ক ছিলেন এবং ঢাকায় একটা বড় রকমের দোকান খুলিয়াছিলেন) কালীপ্রসন্ন বাবুকে বলিলেন। তিনি এইভাবে ঘোষ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন, “মহাশয়, ব'লব কি? একটি বেশ মনস্বী-বাঙ্গালী ছেলে খ্রীষ্টান হইতে চলিয়াছে।” কালীপ্রসন্নবাবু উত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—“ছেলেটিকে আমার নিকট একবার পাঠিয়ে দেবেন তো।” শ্রীনাথ সেন মহাশয় আমাকে ধরিয়া বসিলেন—“চল, তোমাকে কালীপ্রসন্ন বাবু দেখা করিতে বলিয়াছেন।”

ইহার পূর্ব্বেই আমি কালীপ্রসন্ন বাবুর বান্ধবের রীতিমত পাঠক ছিলাম। তাঁহার 'প্রভাত চিন্তা' 'নিভৃত চিন্তা' ভাল করিয়া পড়িয়াছিলাম, এবং তাঁহার লর্ড রিপনকে বিদায় দেওয়ার উপলক্ষে সেই শ্রুতির অমৃত—ভাষার অপূর্ব্ব বিলাস—ওজস্বিনী বক্তৃতাটি শুনিয়াছিলাম। এত বড় লোকের কাছে যাইতে ভয় হইল এবং একটা গৌরবও বোধ করিলাম।

তিনি আমাকে বলিলেন, "সত্যি, তুমি এতটুকু ছেলে, হিন্দু ধর্ম্ম ছাড়িবে ? যে ধর্ম্ম তপস্যা-লব্ধ —"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম. "আপনি ভুল শুনিয়াছেন, আমি হিন্দুই আছি, হিন্দুই থাকিব, কয়েকটা দিন বাইবেল পড়িয়াছিলাম।"

তাঁহার সেই রক্তিম অধরের অন্তরালে সুশ্রেণীবদ্ধ দংক্তপক্তি হাসির ছটায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "সে ভাল, বাইবেল পড়িবে তাহাতে দোষ কি ? অধ্যয়নই চির জীবনের ব্রত হওয়া দরকার। কেউ বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র কেউ বা গণিত পাঠ করেন—কিন্তু সকলেই আনন্দের উৎসের সমভাবে সন্ধান পান ?"

আমি বলিলাম—"এইটি আমাকে বুঝাইয়া দিন। আমাদের ক্লাসে পূর্ণ রাউত সারাটি দিন গণিত নিয়ে ব্যস্ত, সে কি আমি প্যারাডাইজ লষ্ট কাব্য পড়িয়া যে আনন্দ পাই, তেমনই আনন্দ পায় ? লগারিথেম কি তাহাকে সেই আনন্দ দিতে পারে, যাহা মিল্টনের কবিত্বে পাওয়া যায় ? নিউটন কি সেই আনন্দ পেয়েছিলেন যাহা বাল্মীকি বা কালিদাস আস্বাদ করিয়া কাব্য লিখিয়াছিলেন ?"

তাঁহার সে ওজস্বিনী ভাষার পুনরাবৃত্তি করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইব না। কিন্তু তিনি যাহা বলিয়াছিলেন,তাহার মর্ম্ম এই :—"যে বিষয়ে যাঁহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ—তাঁহারা কল্পনাবলে একটা আনন্দের রাজ্যে আরোহণ করেন। কবি, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক—প্রত্যেকেরই সে রাজ্যে তুল্যাধিকার। মনে করিয়া দেখ যে দিন নিউটন একটা এ্যাপেলকে গাছের থেকে পড়িতে দেখিয়া "মাধ্যাকর্ষনের" ন্যায় একটা বিশ্বব্যাপী সূত্র আবিষ্কার করিলেন—সেদিন তাঁর মনের কি ভাব ! সেই ছোট ফলটিকে যে শক্তি মাটিতে টানিয়া আনিল, সেই শক্তি মেঘলোক হ'তে বৃষ্টিকে ধরাতলে লইয়া আসে,—পর্ব্বতের শৃঙ্গ ভাঙ্গিলে সেই শক্তি তাহাকে ঝুঁটি ধরিয়া ধরণী গহ্বরে ফেলে,

—সর্ব্বত্র সেই মহাশক্তি দশদিক ব্যাপিয়া দুর্জ্জয়ভাবে ক্রীড়াশীল। ক্ষুদ্র একটা জলবিন্দুর উপর যেরূপ সমস্ত বিশ্বের প্রতিবিম্ব পতিত হয়,—তাঁহার আবিষ্কৃত নূতন তথ্যটির উপর সেইরূপ জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মূল-শক্তির ইঙ্গিত। সে দিন নিউটন যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন, যোগী-ঋষির ব্রহ্মানন্দের তাহা প্রায় কাছাকাছি।" আমি তাঁহার উদ্দীপনাময় ভাষা ও চোখের দীপ্তির একটা স্মৃতি লইয়া বাড়ীতে ফিরিলাম।

আমি আর বাইবেল পড়িতে যাই নাই। কিন্তু ইহার ছয় সাত মাস পরে একদিন পটুয়াটুলিতে ঢাকার বড় পোষ্টাফিসে উপুড় হইয়া একখানি পত্র ডাকবাক্সে ফেলিবার সময় একটা ঠাণ্ডা সরীসৃপের স্পর্শের ন্যায়—স্পর্শ অনুভব করিলাম, তখন শীতকাল। চমৎকৃত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, আমার পশ্চাতে দীর্ঘাকৃতি ক্ষীণদেহ আলিয়েট সাহেব আমার কাঁধে তাঁহার অকোমল ঠাণ্ডা হাতখানি রাখিয়াছেন। চারি চক্ষের মিলন হইলে তিনি রূঢ় ভাষায় বলিলেন, "Naughty boy, the Oxford Mission has taken a very bad notice of your conduct" দুষ্ট ছেলে, তোমার ব্যবহারে অক্সফোর্ড মিশনের ধারণা তোমার উপর খারাপ হইয়াছে।"

ইহার পর আলিয়েট সাহেবের সঙ্গে আমার জীবনে আর দেখা হয় নাই। স্মিথ সাহেব মরিয়া যাওয়াতে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে আমার সমস্ত কারবার চুকিয়া গেল।

পরীক্ষা-সমস্যা।

আমার গণিতের প্রতি চির বিমুখতার দরুণ এল, এ পরীক্ষা যে কোন কালেই পাশ করিতে পারিব – কেহই তাহা বিশ্বাস করিতেন না। সমস্ত পাঠ্য পুস্তকের প্রতিই আমি নিতান্ত নিশ্চেষ্ট উদাসীনতা দেখাইয়াছি। বুথ সাহেবের (গণিতের অধ্যাপক) ঘণ্টায় আমি ও. ইয়াসিনউদ্দিন গ্যালারীর সর্ব্বোচ্চমঞ্চে বসিয়া ছবি আঁকিয়াছি। ইংরেজীর অধ্যাপক এস, সি হিল সাহেব আমায় বড় ভালবাসিতেন, আমি ক্লাসে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট ছিলাম, তিনি আমাকে কত রকমের রহস্য করিতেন। আমাদের অধ্যাপক সারদারঞ্জন সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গবর্ণমেণ্টের কাজ ছাড়িয়া দিয়া মেট্রপলিটনের অধ্যাপক হইলেন। কালজিয়েট স্কুলের প্রসন্ন পণ্ডিত কলেজের অধ্যাপকের পদে উন্নীত হইয়া রঘুবংশের ত্রয়োদশ অধ্যায় পড়াইতে লাগিলেন,—একদিন ক্লাসে গোলমাল করাতে তিনি আমার কান মলিয়া বেঞ্চীর উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া গর্জ্জন করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন –"কলেজে পড় ছিস্ বলে ভেবেছিস্. আমার মার-ধরের হাত এড়াইয়াছিস! এর পরে একখানি ভাল বেত নিয়ে আস্‌ব।" ফাষ্ট-ইয়ারের কোন ছেলেকে এখন এইরূপ ব্যবহার করিলে সেটা একটা অদ্ভুত কাণ্ড হইত। আমি ক্লাসে খুব ছোট থাকাতে আমার এইরূপ দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে হইত। আমাদের সংস্কৃতের সিনিয়র অধ্যাপক কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, লজিকের অধ্যাপক মিঃ পি. কে, রায় অতিশয় দয়ালু ছিলেন –ইহাঁরা ক্লাসের ছেলেদের প্রতি দুর্ব্ব্যবহার করিতেন না।

পরীক্ষা নিকটে আসিল। আমি আমার চিরন্তনী রীতি অনুসরণ করিয়া পরীক্ষার ঠিক একমাস পূর্ব্বে পাঠ্যপুস্তক হাতে লইলাম। দুই চার দিনের মধ্যে ইংরেজী পড়িয়া ফেলিলাম। কারণ ইংরেজীতে আমি সেক্ষপীয়র, শেলি, বাইরণ, টেনের ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি বড় বড় বই পড়িয়া ফেলিয়াছি,—এল, এ পরীক্ষার পাঠ্য আয়ত্ত করিতে সময় লাগিল না। টিগণমেট্রি ও গণিতের অন্যান্য পুস্তকের কতক অংশ কপাল-ঠোকা ভাবে মুখস্থ করিয়া ফেলিলাম। সেই সকল জায়গা হইতে প্রশ্ন আসিলে পারিব, না হইলে নয়। গ্যানোর ফিজিক্স ভারি বই, উহা আমার ছিল না, ইতিপূর্ব্বে উহার আকারটা দেখিয়াছিলাম মাত্র, কোন দিন পাতা উল্টাই নাই। উহাতে ১০০ নম্বর ছিল, ১৫এর নীচে পাইলে নম্বর গণা হইত না, পাশ সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে কোন বাধ্য-বাধকতা ছিল না।

ইংরেজীতে পরীক্ষা হইয়া গেল। গণিতের পরীক্ষা দিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—পাশের নম্বর থাকিবে। কিন্তু গ্যাণোর ফিজিক্সের ১৫ নম্বর না থাকিলে পাশ থাকে না। তখন প্রত্যুষে পরীক্ষা হইত। গণিতের পরীক্ষা শেষ হইলে আমি বেলা ১০টার সময় বাড়ী আসিয়া আহার সমাধা করিলাম, পরদিন ৬৷৹ টায় পরীক্ষা। শুধু নাম শুনেছি— তখনও চোখে দেখিনি—গ্যানোর সঙ্গে প্রায় এবম্বিধ পরিচয়। ৹টার পর মহেন্দ্র লাল রায়দের মেসে গেলাম, সে ফাষ্টইয়ারের ভাল ছাত্র, আমি তাহাকে বলিলাম, "তোরা গ্যানোর কতদূর পড়িয়াছিস্?" সে বলিল "অর্দ্ধেকটা।" গ্যানোর দুই পেপার। পুরো বইতে ১০০ নম্বর, এবং এক একটা পেপারে ৫০। আমি মহেন্দ্রকে বলিলাম "তুই চল্, আমার সঙ্গে তোর গ্যানো নিয়ে।' মহেন্দ্র গ্যাণো নিয়ে আমাদের বাসায় আসিল— সে ঐ বই ভাল করিয়া পড়িয়াছিল, উহার প্রায় তিন শত পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত প্রথমার্দ্ধ, দ্বিতীয়ার্দ্ধও তদ্রূপ। সে পড়িয়া যাইতে লাগিল, এবং যেখানে

আমার খট্‌কা লাগিল তাহা বুঝাইয়া বলিল। অধিকাংশই যন্ত্রাদির কথা। আমি নিজে নিজে চেষ্টা করিলে যেটি বুঝিতে দুই ঘণ্টা লাগিত,তাহা তাহার সাহায্যে আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুঝিতে পারিলাম। এই ভাবে বেলা বারটা হইতে রাত্রি নয়টার মধ্যে প্রথমার্দ্ধ পড়া শেষ হইল। তার পর সে বিদায় লইল। আমি নয়টা হইতে দুইটার মধ্যে সেই অংশ আবার নিজে পড়িয়া ফেলিলাম। তারপর ২টা হইতে ৬টার মধ্যে আর একবার পড় হইল এবং ছয়টার সময় কলম ও ছুরি লইয়া পরীক্ষা দিতে গেলাম। প্রশ্ন পড়িয়া দেখিলাম, সকলটিই জানি, খুব আনন্দের সহিত উত্তর করিলাম। বাসায় আসিয়া দেখি প্রায় সব উত্তরই ভুল হইয়াছে। অর্থাৎ যন্ত্রগুলির ভারি গোলমাল করিয়া বসিয়াছি। হাইড্রলিক প্রেসের বৃত্তান্ত লিখিতে যাইয়া অপর কোন এক যন্ত্রের কথা লিখিয়াছি। এত অল্প সময়ের মধ্যে নামগুলি ঠিক মনে রাখিতে পারি নাই হিসাব করিয়া দেখিলাম, ৫০এর মধ্যে ১২ পাইব, আর সকলই ভুল হইয়াছে। তখন ভাবিলাম, যদি আর একটি দিন হাতে পাইতাম, তবে হয়ত ৫০এর মধ্যে ৫০ই পাইতাম। কারণ বুঝিবার বা শিখিবার কিছু বাকী ছিল না।

সে দিন শনিবার, "ভাবিলাম যাহা হউক, এক পেপারে ১২ পাইব, আর এক পেপারে ৩ পাইলেই তো ১৫ হইবে, তাহা হইলে তো নম্বর গণনার মধ্যে থাকিবে। সেদিন শনিবার, অর্দ্ধ দিবস পাইলাম, শনিবারের রাত্রি, পুরো রবিবারটা ও রবিবারের রাত্রিটা। এতটা সময়ে কি ৫০ এর মধ্যে ৩ পাইবার উপযুক্ত পাঠ প্রস্তুত করিতে পারিব না? পূর্ব্বের তো আধ্ দিনে ও একটা রাত্রের পরিশ্রমের ফলে ৫০ এর মধ্যে ১২ পাইয়াছি।" অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া ১১ টার সময় ঘুমাইয়া পড়িলাম! একটার সময় ঘুম ভাঙ্গিলে মহেন্দ্রের গ্যানো খানি লইয়া বসিয়া গেলাম। কিন্তু এক বিপদ, সে দিন বুঝাইয়া দিবার কোন লোক ছিল না। মহেন্দ্র